Library Copy

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

অধ্যক্ষ ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী

এবারের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো কলেজের বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের গৌরব ও আনন্দের মধ্যে। একটি শিক্ষায়তনের পঁচাত্তর বছর ইতিহাস রচনার দাবী রাখে। সে ইতিহাসে নানা অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ে নানা ইতিহাস। কতো কিশলয় পর্ণে পরিণত হচ্ছে, কতো মুকুল ফলে পূর্ণ হয়েছে, ঝরেছে কতো কোরক। এই প্রাচীন বিদ্যাভবন কতো স্মৃতির দীঘল সাক্ষী।

তারই সিংহদ্বারে পঁচাত্তর ডাক দিয়েছে। নতুন এক মাত্রা যোজিত হয়েছে ১৭ই জুলাই, ১৯৯০ তারিখে: একানব্বই-র ১৭ই জুলাই তারিখে মহাবিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হবে এবং অপেক্ষা চলবে শতবর্ষের সাগর সঙ্গমের।

এই প্রসারিত প্রেক্ষিতে ছাত্র সংসদ তাদের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছে। অন্যান্য বারের মতো এবারেও বেশ কিছু লেখা ছাত্র ছাত্রীদের সৃজন ক্ষমতার প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। বর্তমান সংখ্যার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো ১৯২৪ সালে প্রকাশিত কলেজ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তাবত সংখ্যাগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য লেখা সংগ্রহ ক'রে ছাত্র সংসদ একটি ক্রোড়পত্র রচনা করেছে। সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রমুখ প্রাক্তন ছাত্র সাহিত্যিকদের লেখা। এই ক্রোড়পত্র এবছরের কলেজ পত্রিকায় একটি নতুন পরিমাপ সংযোজিত করল। ছাত্র সংসদের এই সৃজনশীল পরিকল্পনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সাফল্যের সজ্জা অঙ্গজুড়ে জড়িয়ে নিয়ে যে বার্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো, তা সকলের কাছে সমাদৃত হবে—এই গভীর বিশ্বাস রাখি।

★ আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ—১৯৮৯-৯০

প্রকাশক

অধ্যক্ষ ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী

মুদ্রক

"প্রিন্টেক্সট"
২৯ডি, হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-২৬

প্রচ্ছদ অঙ্কন

গৌতম বসু

প্রচ্ছদ

শিবরীনা

উপদেষ্টা মণ্ডলী

অধ্যাপক শ্রীঅমল কুমার চক্রবর্তী
„ শ্রীঅমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শ্রীআশুতোষ খান
„ শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

সম্পাদন সহযোগী

অনির্বাণ গাঙ্গুলী
দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত
ঋত্বিক ঘোষ
সৌমা বসু
কল্লোল রায়
শঙ্খ ঘোষ
সোমনাথ মালাকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক মিশ্র
„ শ্রীরনেন দত্ত
অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত
শ্রীসত্যেন রায়
শ্রীঅমিয় ডোগরা
শ্রীপল্টু রায় চৌধুরী
ও প্রিন্টেক্সট-এর কর্মচারীবৃন্দ

"আমরা উত্থিত হব মৃত্যুর মধ্য থেকে—
মৃত্যু হনন, মৃত্যুর উদ্দেশ্য।"

আমরা গভীর ভাবে স্মরণ করি—

★ লাতিন আমেরিকা এবং পূর্ব ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অক্ষুন্ন রাখতে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন।

★ পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আসাম, দার্জিলিং সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় যারা নিহত হয়েছেন।

★ ত্রিপুরায় আধা ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যারা নিহত হয়েছেন।

★ অন্ধ্রউপকূল সহ সারা বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন।

★ ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত বছরে আমরা যাদের হারিয়েছি।

সূচী

কবিতা	আমরা অপেক্ষমান ॥ পুষ্পব্রত মুখোপাধ্যায়	১১
	নবান্নের প্রতীক্ষা ॥ অর্ণব বন্দোপাধ্যায়	১২
	পাখী ॥ সুজয় সরকার	১৩
	হতাশায় আশা ॥ অম্লান লাহিড়ী	১৫
	এখানে শহর নেই ॥ অলোক সরকার	১৬
	তোমাকে লেখা ॥ কল্লোল রায়	১৭
	নাম তার জীবন ॥ অরুন্ধতী ঘোষ	১৮
	অন্বেষণ ॥ দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত	১৯
	যুগলবন্দী ॥ অধ্যাপক অমল চক্রবর্তী	৩২
	ছড়া ॥ অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত	৩৩
	দুটি কবিতা ॥ অধ্যাপক কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	৩৪
প্রবন্ধ	শতবর্ষের আলোকে জীবন শিল্পী এবং সমাজ সচেতন চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন ॥ শুভ দত্ত	২০
	সত্যি কি নেলসন ম্যাণ্ডেলা কি মুক্তি পেয়েছেন ? ॥ ঋতজা ঘোষ	২৩
বিতর্ক	সার্বজনীন উৎসব কি সর্বজনের উৎসব ॥ সুময় মুখার্জী	২৬
	"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলো" ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায়	২৮
গল্প	অধ্যয়নং তপঃ ॥ শান্তনু সেন	৩০

ENGLISH SECTION

Poetry	Ripples of Remembrance ॥ Rupa Sen	৩৫
	Where are the Little Girl's Gone ॥ Papia Ghosal	৩৬
	Life ॥ Sumit Mitra	৩৭
Essay	Pleasures and Problems of Living in a Large Family ॥ Urmi Dutta	৩৮
	The Death Beam ॥ Atunu Mukherjee	৪০
Tips	Think Poster ॥ Rima Bose	৩৯

প্রসঙ্গত ঃ

প্রধান সম্পাদক
সন্দীপ বসু

সহঃ সম্পাদক
ধীমান দাশগুপ্ত
অনির্বাণ ঘোষ
অনুপম ঘোষ

বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে আনন্দ, দূরে ঢাকে পড়ছে বোধনের কাঠি, চণ্ডীমণ্ডপে কুমোর ক্ষিপ্রহাতে অসুর দমনী দুর্গার মুখে দিচ্ছে শেষ প্রলেপ। নগ্ন, অর্ধনগ্ন শিশুরা অবাক ডাগর চোখে দেখছে খড়ের কাঠামো কি করে ধীরে ধীরে প্রতিমায় পাচ্ছে নান্দনিক-রূপ। দূরে বিদেশে বিদেশবাসীর মনে বেজে ওঠে বিচ্ছেদের সুর। কখন আসবে আপনজন। এই সময়টা তাই ভাল লাগার, ভালবাসার। সবকিছুকে ভালো লাগার সঙ্গে জন্ম নেয় ভালবাসা। মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসা।

ঠিক এই সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের বার্ষিক পত্রিকা। ছাত্রজীবন বৃহত্তর জীবনের এক ক্ষণিক বৃত্ত, উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ। ছাত্রজীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে মনে ভীড় করে নানা স্মৃতি। তাই স্মৃতি সতত সুখের, তা যত পুরোনো হয় ততই আকর্ষনীয়, পরবর্তী জীবনে এই নষ্টালজিয়া কল্পনার জগতকে মধুময় করে তোলে।

কলেজ পত্রিকা এই স্মৃতিকে ধরে রাখবার অন্যতম বাহক। কলেজ জীবনের ছোট ছোট সুখস্মৃতি, ব্যাথা বিধুর ঘটনা মনকে আলোড়িত করে, ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই মিষ্টি ভালবাসার অতীতে। তাই আমি চেষ্টা করেছি এই পত্রিকা এবং পূর্বে প্রকাশিত দেওয়াল পত্রিকায় তার প্রতিফলন ঘটাতে।

পত্রিকা সম্পাদক হলেই সম্পাদকীয় লিখতে হয়। যে রাঁধে কৃতিত্ব তার, পরিবেশনকারীর নয়। আজকের পত্রিকার কৃতিত্ব তাঁদের যারা মনের মাধুরী মিশিয়ে পত্রিকাকে অলংকৃত করেছেন। আমার কৃতিত্ব শুধু পরিবেশন করা। আর সঠিক পরিবেশনের অভাবে যদি গুণগত দুর্বলতা দেখা দেয়, তার দায় আমার।

সবশেষে মনের সবটুকু আবেগে ঢেলে ভালোবাসা জানাই সমস্ত ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের, যারা আমার পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে এবং প্রণতি জানাই সেই ক্ষনজন্মা তেজস্বী পুরুষকে, সেই শিক্ষাবিদকে যিনি বর্তমান বাংলার অন্যতম রূপকার, যাঁর প্রভাবে বাংলা তথা ভারতের অসংখ্য গুণীজন এই পৃথিবীতে জ্ঞানের আলোক বর্তিকা জালিয়েছেন—সেই আশুতোষকে। আমি ধন্য।

পুরাতনী

কবিতা	শঙ্খজাতক ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪৫
	দিনান্তে ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৪৬
	মেঘবতী ॥ সামসুল হক	৪৭
	ছন্দের অপেক্ষায় ॥ উৎপল কুমার বসু	৪৭
	বেতার : ১৯৪৩ ॥ দীনেশ দাশ	৪৮
	বিবর্ণ রুমাল ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু	৪৯
	তোমার শতাব্দী ভেঙে ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	৫০
	একটি সুদূর ইচ্ছে ॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১
	বন্ধুর জন্মদিনে ॥ মানস রায়চৌধুরী	৫২
রম্যরচনা	রোল নাম্বার সিক্স ॥ বিমল মিত্র	৫৩
প্রবন্ধ	আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ॥ অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য	৫৭
	List of Previous Editors	৬১
সংসদ বার্তা	প্রতিনিধি পরিচিতি	৬৫
	প্রতিনিধিদের কিছু কথা	৬৬

পত্রিকার ছবিগুলো তুলেছে কল্লোল রায় ও প্রবাল মুখার্জী — হাঁ আমাদেরই বন্ধু।

★ তিনশ বছরের কোলকাতায় শোষিত মানুষের প্রতিনিধি নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে স্বাগত জানাই।

● তিনশ বছরের কোলকাতার শ্রেষ্ঠ উপহার রঞ্জী বিজয়ী বাংলা দলকে অভিনন্দন জানাই।

● লিয়েণ্ডার পেজকে আমরা জুনিয়র উইম্বলডন ট্রফি উপহার দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

● অভিনন্দন জানাই মনোজ কোঠারীকে, বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য।

College এ বর্ষ-ব্যাপী প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব

ক্যামেরার চোখে

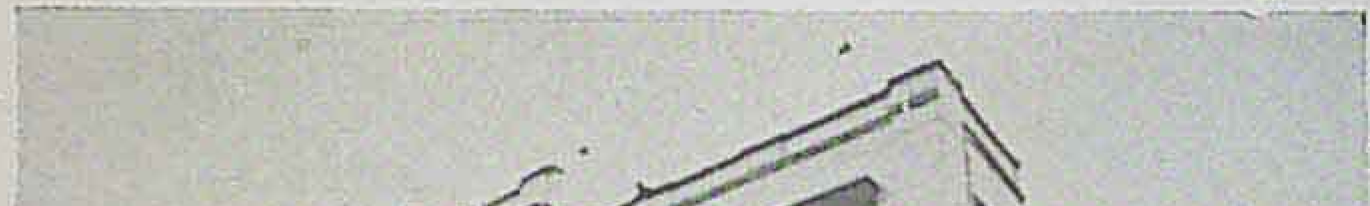

৭৫ বছরের আলোকে কলেজ

মাননীয় রাজ্যপাল "আশুতোষ ও তার সময়" গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যপাল

প্রিয় ছাত্র-সংসদ—সাফল্যের আলোকে

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে অধ্যক্ষের হাতে ছাত্র-সংসদ সম্পাদক ৭৫ হাজার টাকা ছাত্রদের তরফ থেকে তুলে দিচ্ছেন।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট চ্যাম্পিয়ন কলেজ টেবল-টেনিস টিম।

ছাত্র সংসদের আর একটি সাফল্য—"দেওয়াল পত্রিকা।"

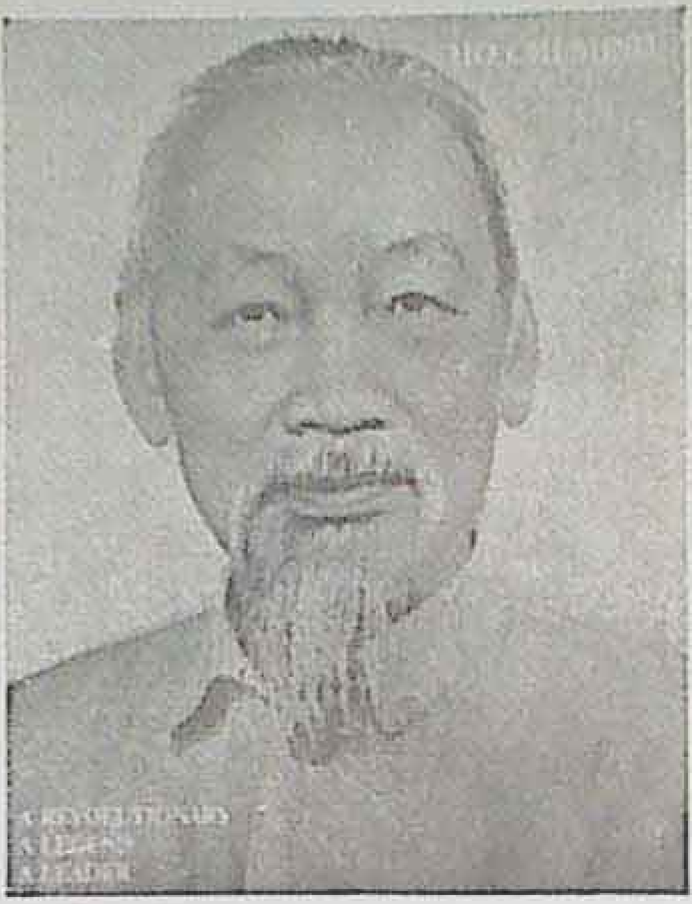

"কাল রাত্তিরে
সূর্যের মুখে ফুটে উঠেছিল
হো-চি-মিনের হাসি।
অথচ কাল রাত্তিরে
সূর্য ওঠার কথা ছিল না।

পরশু বিকেলে
সাত বছরের কালো গোলাপটা
থেঁৎলে গেল
ইস্পাতের লরীতে।
অথচ কালো গোলাপটার
ফুটপাথে ফোটার কথা ছিল না।"

আমরা অপেক্ষমান

পুণ্যব্রত মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ/অর্থনীতি সাম্মানিক

আমি সেই তারার জন্য অপেক্ষা করে আছি
সে তারা একদিন রাতে এসে
আমাদের এক এক করে প্রশ্ন করবে—
"তোমরা ভালো ছিলে ? ভালো আছো ?
সবাই ভালো আছে ?

সেই প্রশ্নে মাথা নোয়ানোর জন্য
আমি অপেক্ষা করে আছি।
তাকে সজল চোখে নালিশ করার জন্য
আমি অপেক্ষা করে আছি।

যা শুনে সে ক্ষুব্ধ হবে—
নিজেকে ছাই করে সে জ্বালিয়ে দেবে
ওদের,
যারা আমাদের ভালো থাকতে দেয় নি, দিচ্ছে না
কাউকে দিচ্ছে না।
সিন্দুকে তুলে রেখেছে আমাদের অধিকার
স্বাধিনতা সবকিছু ;

ওদের সাবধান হতে বলো—
সেই তারা এক রাতে আসবেই।
আমি যে তার জন্য অপেক্ষা করে আছি
আমরা সবাই তার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

নবারুণের প্রতীক্ষা

—অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়
একাদশ শ্রেণী/বিজ্ঞান, ক বিভাগ

এখন দিনের ব্যস্ত, ত্রস্ত পৃথিবীটা
শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে,
জন-কোলাহল-মুখর রাজপথে এখন
বিরাজমান শ্মশানের শান্তি ॥

এবার ধীরে-ধীরে জেগে উঠছে
এক রাতের পৃথিবী ;
আকাশে চেয়ে থাকা একফালি চাঁদ
যার অতন্দ্র প্রহরী ॥

এখন সময় শুধু তাদেরই, দিনের বেলায়
যাদের দেখা যায় না ; —
চোর, ফেরারী আর জুয়াড়ীর দল—
দিনের আলোকে যারা ভয় পায় ;
কিন্তু অন্ধকার রাত ঘনিয়ে এলে
যারা নিশ্চিন্ত বোধ করে।
এখন জেগে থাকার, ঘুরে বেড়াবার সময়
তাদেরই, শুধু তাদেরই ॥

কিন্তু, এই অলিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম,
হ্যাঁ, তাও আছে ;
সেই ব্যতিক্রম শুধু আমি, আর রাস্তার
ঐ খোঁড়া, বুড়ো কুকুরটা।

আমরা রোজ, প্রতি রাতে, প্রত্যেক চাঁদে
এমনি করে জেগে থাকি,

বুঝি অপেক্ষা করি
দেখি চোখ মেলে, শুনি কান পেতে ;
কিন্তু কেন ?
কার, কিসের প্রতীক্ষায় ?
ঠিক মতো বলতে পারি না,
বুঝতেও পারি না হয়তো
তবু আবছা কুয়াশার মতো
যেন মনে হয়,

দিনের আশায়, ঘুমভাঙা ভোরের পাখির
প্রথম কাকলি শোনার আশায়,
এই আঁধার রাত কেটে এক নতুন
দিনের আলো দেখার আশায়,
এক নতুন, শান্তির, আনন্দের পৃথিবীতে
প্রাণ ভরে বাঁচার আশায়,
এক নির্মল, মুক্ত আকাশের তলায়,
মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেবার আশায়।

এ রাত একদিন তো নিশ্চয় কাটবে
আশা-ভরসায় ভরা নতুন দিন
কখনো তো নিশ্চয় আসবে
আমার নবারুণের প্রতীক্ষা
ব্যর্থ হবে না।

পাখী

সুজয় সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ/ইংরাজী

ছাদের কোনায় দাঁড়িয়ে আকাশে
উড়ে যাওয়া দুটি পাখিকে শুধালাম
পাখী কোথায় যাচ্ছ? ঘন নীল
আকাশের বুকে পেঁজা তুলার মত

ভেসে বেড়ানো পাখি দুটো যেন কোন্
রোমাণ্টিক চিন্তায় মগ্ন। অবজ্ঞা নয়,
কেমন একটা নিরাসক্ত আনন্দের ভাব নিয়ে মাটি
ও আকাশের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে
পাখি দুটো। দূরে ঐ যে বড় মেঘটা, ওর
ওপারেই বোধ হয় অনন্ত আনন্দ ; ডানার
পাল উড়িয়ে দিয়ে প্রেয়সীর কাছ ঘেঁসে এক
ভাবনাহীন ভাবনার মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে
একদিন এক প হাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মৌ'কে
জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি 'প্যানথেয়িস্ট' ?
উদার আকাশের মত একগাল হেসে বলেছিল
জীবন আর শরতের আকাশের মেঘটা যদি,
একসাথে ভাসতে পারে, তবে আমি তাই।
কিন্তু জীবনটা কি ঠিক এরম ?
আধা সিমেট্রি দিয়ে কাজ চলেনা।
তবুও এই বোধটাই বোধ হয় সব নয় ;
ভালবাসা বোধ হয় আত্মপলব্ধির থেকেও
বড় কিছু ; প্রেয়সীর ঘন কালো চোখের
মধ্য দিয়ে ঐ যে শুকতারা দেখা যায়,
যেখানে চিরকাল আনন্দের বাস—
মনের ক্যানভাসে যেখানে প্রশ্ন চিহ্ন নেই
সুন্দর অবারিত দ্বার দিয়ে যেখানে সুরের
ঝঙ্কার ওঠে, বীণার তারগুলি দিয়ে যেখানে
রামধনু দেখাযায়, পাখীর গন্তব্য বোধ হয়
সেখানেই। দু'চোখের দেখা নয়, এই আধবোঝা
পৃথিবীর না বোঝার পথটাই
বোধ হয় সেদিকে গেছে।

হতাশায় আশা

অম্লান লাহিড়ী
দ্বিতীয় বর্ষ/পদার্থ বিদ্যা

এখন নিস্তব্ধ চারিধার,
যেন একটা বিরাট আঁধার গ্রাস করতে আসছে
আমাদের সত্বাকে ,
আলো দেখা যায় না কোথাও
আলো খুঁজতেও সাহস করে না কেউ,
অন্ধকারের গলি খুঁজে বেড়ায় মোহবিষ্ট মানুষ ।

মনে হয় পৃথিবীটা দাঁড়িয়ে আছে
এক অতল খাদের ধারে—
পলকে ঘটে যাবে বিপর্যয়
ঝোড়ো হাওয়ার সামনে কম্পমান প্রদীপ শিখার মত
অসহায় আমাদের চেতনা, বিধ্বস্ত আমাদের বিচার বোধ ।
দিকে দিকে স্বার্থের ফিসফাস্ শব্দ—
একাকীত্বের বিষাক্ত ফণা ছোবল মারছে,
ছটফট করছে সবাই, রুদ্ধদ্বারে মরছে মাথা ঠুকে ।
তবু কেউ অর্গল খুলবে না, প্রাচীর ভাঙবে না—
তিলে তিলে সইবে স্বেচ্ছা নির্বাসনের যন্ত্রণা ।

হয়তো একদিন সুতীব্র আলোক রেখা আসবে
নিকষ কালো আঁধারের বুক চিরে,
ভয়ংকর শব্দে ভেঙে পড়বে নিঃসঙ্গতার দেওয়াল,
রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যাবে মানুষের কলতান
বাঁধ ভাঙা নদীর মত ।

হয়তো সেদিন আবার ফিরে পাবো
হারিয়ে যাওয়া ছন্দ,
খুঁজে নেব বিস্মৃত আনন্দ,
কিন্তু আজ কেন আমরা এমন প্রাণহীন নিস্পন্দ ?

এখানে শহর নেই

—আলোক সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ/অর্থনীতি

এখানে শহর নেই
কলকারখানা, আর ঘড়ির শাসন
মদের বোতল আর মানুষের ভীড়
আর মেয়েমানুষের—

এখানে কিছুই নেই।

নিরন্নের কান্না
আর অতিভুক্তদের আদিমতা
এখানে বিলুপ্ত সব।

* * *

এখানে ঘাসের বুকে
মিশে আছে পৃথিবীর প্রথম সঙ্গীত—
যার সুরে বেজে ওঠে আহ্বানের গান আর ওঙ্কারের ধ্বনি
খুলে যায় আলোকতোরণ
দেখা দেন ঊর্দ্ধবাহু, কটিবাস, মেরীর সন্তান
যন্ত্রনা বিধুর মুখে
ফুটে ওঠে প্রার্থনার গান;

* * *

যুগান্তের পার থেকে আশীর্বাদ নিয়ে
ওঠে সূর্য—
জাগে নব আয়ুর স্পন্দন

তোমাকে লেখা

কল্লোল রায়
দ্বিতীয় বর্ষ/কলা বিভাগ

বহু যুগ বাদে এই বৃষ্টি ও মেঘের দিনে
তোমাকে লেখা।
সমস্ত পুরনো কথা, জানা কথা—
তবুও পুনরুক্তি করে ফেলি, যদি ভুলে যাও।
থাক মনে পড়া-পড়ি,
ভাল আছো—
বিয়ের পর আরও একটু মুটিয়েছো নিশ্চয়ই
তোমার কানের পাতার তল ব'য়ে এখনও
সেই রকম চুলগুলো ওড়ে।
একদিন এরকম বৃষ্টিতেই তোমার মুখে জমা
বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর মত জ্বলছিল।
কি একটা কথায়
আকাশ উদ্ভাসিত করে তুমি যখন হাসলে,
তখনই আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।
খেয়াল হল বৃষ্টি আসছে
বুঝিনি বৃষ্টির আগের ঝড়ে এতো আবেগ ছিল
তাই যখন হাওয়া দিল
প্রেমকে আর ধরে রাখতে পারি নি
যাই হোক
ভাল থেকো।

নাম তার জীবন

অরুন্ধতী ঘোষ
প্রথম বর্ষ/কলা বিভাগ

জীবনের চাকা চলতে চলতেও
চলার মধ্যে থেমে আছে।
কোথায় সেই স্বপ্ন ভরা দিন?
যখন;
বাতাসে ছিল সুগন্ধ
কানের পাশে ভ্রমরের গুঞ্জন
রাত্রি শেষে নতুন দিনের খেলা
সেখানে ছিল আশা প্রত্যাশা
আর স্বপ্ন,—
ঘড়ির কাটা তো ঘুরবেই, তবু
রাত্রি দিনের হিসেবে সেই এক।
বারো বারো করে ভাগ করলে
বাকি থাকে শুধু শূন্য,
যেমন,

হৃৎপিণ্ড? ভাঙলেও কাজ করে
নিঃস্ব হৃদয়েও তার নিত্য কাজ
তেমনই, জীবনের চাকা, কারো
চলার মধ্যেও থেমে আছে
কারো, অনেক পথ অতিক্রম
করে যাচ্ছে, কারো বা
শুধু ইঞ্জিনটা ……………,
চাকা ঘুরছে একই স্থানে
শুধুই শব্দ,
গতি বাঁধা
চাকা তবু ঘুরছে
ঘুরবে।

অন্বেষণ

দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত
বিদায়ী বর্ষ বাংলা

আমি সেই লোকটার খোঁজে আছি
যে আমার হাত দেখে বলে ছিলো—
জীবনে বড় হবে, নাম হবে, যশ হবে
ভালো মানে যা কিছু সবই পাবে,
রাহু নাকি মোটে দানা বাঁধে নি !

আমি তাই লোকটার খোঁজে আছি,
কাকের মত আমি ভাত খুঁজি, ধরাপড়ে
ভাই ছেলে, বাবা মা ডাষ্টবিনে ভাত খুঁটে খায়
বোনের জীবন বাঁধা হোটেলের দরজায়
শান্তির পায়রা আজও ওড়েনি ।

আমি তবু লোকটার খোঁজে আছি
রক্তে হাত রাঙাবার বাসনায় নয়
এ হাতে তো অনেক কথা রেখা আছে
কাছে পেলে শুধু একবার-একবারই বলবো
"তুমিও কি কভু সুখ পাওনি ?"

শতবর্ষের আলোকে জীবনশিল্পী এবং সমাজ সচেতন চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন

শুভ দত্ত
একাদশ শ্রেণী/বিজ্ঞান

চার্লি চাপলিন—চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদ পুরুষ। চার্লি হাসির রাজা, অঙ্গভাষায় কথা বলা মানুষ। শুধু এটাই যদি শেষ কথা হত, তাহলে একশ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন আমাদের ভালোবাসায়, আমাদের বেদনায় এমন করে তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন না—তার মৃত্যু হত, মৃত্যু হত আমাদের আয়নার সামনে দাঁড়ানো অস্তিত্বের।

তাই চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে যে কোন আলোচনা শুধু তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের বা শিল্প মাধ্যমের আলোচনা নয়, একদিকে তার জীবন অন্যদিকে যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপকে, সেই যুদ্ধের মানবিকতাকে ফিরে ফিরে দেখা আর সমস্ত গ্লানি আর হতাশার মধ্যে খুঁজে ফেরা জীবনের নতুন নতুন মানে।

চার্লস চ্যাপলিনের জন্ম ১৮৮৯ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল লণ্ডন শহরে। তাঁর বাবা মা দুজনেই ছিল অভিনয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাই নৃত্যগীত নৃত্যাভিনয়ে মেশানো আনন্দানুষ্ঠানে শৈশব থেকেই চার্লিকে মায়ের সঙ্গে দেখা যেত। কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যু, মায়ের মানসিক অসুস্থতা তাকে স্বভাবতই বহু বঞ্চনা, অপমান ও ক্ষুধার অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে প্রতিদিন।

ব্যথা ও অপমানের দিনগুলি তার জীবনে এক অসাধারণ মাত্রা সংযোজন করেছে। প্রকৃতপক্ষে চ্যাপলিন—কৌতুকাভিনেতা। 'চার্লি' একটি বিশেষ যুগ ও পরিপার্শ্বের সৃষ্টি—কোনো ব্যক্তির রচনা নয়। ইতিহাস, তাঁর সময়কালিন যুগের ব্যথাবেদনা, তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল হাত পেতে, চার্লির সঞ্চয়ে ছিল তাঁর পারিবারিক আবহাওয়ার লালিত অভিনয় প্রতিভা, ছিল সহজাত বুদ্ধিদীপ্ত দরদী মন, জীবনরসে ভরপুর—চার্লি যুগের চাহিদাকে অস্বীকার করেন নি বরং যুগকে অগ্রসর করেছেন দৃঢ়, সমৃদ্ধ পদক্ষেপে—নতুন পৃথিবী রচনার স্বপ্ন দেখেছেন।

চার্লি এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে আর তাঁর জীবৎকালেই তিনি দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও পরিসমাপ্তি। জীবন তাঁর উপর বিচিত্র

স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনাচরণের অভ্যাস পেরিয়ে, অনভ্যস্ত হাতে তাকে নাম লেখাতে হয়েছে শ্রমজীবি মানুষের দলে। আবার সেই চার্লিই অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের চরম সীমায় উঠেছেন, পেয়েছেন প্রচুর যশ, খ্যাতি ও সম্মান। এক জীবনে এই দুই কোটিতে বিচরণ তাকে একদিকে মাটির পৃথিবী সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা যোগান দিয়েছে। আত্মবিশ্বাসী দৃঢ়চেতা, দরদী মনের অধিকারী চ্যাপলিন যাবতীয় অসামঞ্জস্যকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। অনন্য অভিজ্ঞতায় জন্ম নিয়েছে কৌতুকাভিনেতা চ্যাপলিন, শিখেছে জীবন মানেই দ্বন্দ্বের সমন্বয়।

তার অভিনীত ও পরিচালিত সুবিখ্যাত দশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির সারণী : দ্য কিড (১৯২০), দ্য গোল্ড রাশ (১৯২৫), দ্য সারকাস (১৯২৮) সিটি লাইটস (১৯৩১), মডার্ণ টাইমস (১৯৩৬), দ্য গ্রেট ডিকটেটর (১৯৪০), মসিয়ে ভার্দু (১৯৪৭), লাইম লাইট (১৯৫২), এ কিং ইন নিউইয়র্ক (১৯৫৭) ও এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং (১৯৬৭) কাউন্টেস ফ্রম হংকং তাঁর শেষ ছবি, তাঁর ছবিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নানা ভাবে কাজে এসেছে। নাপিতের দোকান থেকে, ষ্টেশনারি দোকান, ছাপাখানার বিরাট মেশিন চালানোর দক্ষতা থেকে ফাইফরমাস খাটবার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিলো। সর্বস্তরেই তিনি ভুলতে পারেন নি শৈশবের দারিদ্রের কথা। অথচ এই শক্ত কঠিন লাঞ্ছিত জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে খাঁটি সোনার মত সাচ্চা প্রাণেরও হদিশ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেই সব পোড়-খাওয়া, শিরদাঁড়া-ভাঙ্গা মানুষগুলোর মধ্যে। এরই মধ্যে আবিষ্কার করেছেন প্রাণের পরিবেশ, সৃষ্টির প্রেরণা। পরবর্তীকালে চ্যাপলিন তার শিল্পসৃষ্টির এই উৎসের কথা, বেদনাবোধের কথা খুব সহজ করে অনাড়ম্বর ভাষায় বলেছেন, 'I have known humiliation And humiliation is a thing you cannot forget' চ্যাপলিন তাঁর ছবিতে দুটি রসকে একই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। হাস্য ও করুণরস। কারণ মূল বিষয় তাঁর ক্ষুধা। তাঁর মা অনাহারে উন্মাদ হয়েছিলেন, তাঁর ছবিতে তাই ক্ষুধা এসেছে বার বার, পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যুদ্ধের কাল; কারণ দুই বিশ্বযুদ্ধের অভ্যন্তরেই তো জীবন যুদ্ধ। আর এই জীবনযুদ্ধ চ্যাপলিনের ভাবনায় একমাত্র প্রকাশ সম্ভব কোনো এক ভবঘুরের মাধ্যমে। যার ফলে চ্যাপলিন তার মাধ্যমেই গোটা মানব সমাজকেই খুঁজেছেন। কোনো বিশেষ শ্রেণীর নায়ক কখন সর্বশ্রেণীর কাছে সমান জনপ্রিয় হতে পারে না। চাপলিন তাই ভবঘুরে চরিত্রকে গ্রহণ করেছেন। এক অদ্ভুত সাজে ঢিলেঢালা ট্রাউজার, উঁচু টুপি, খাটো কোট, বিটকেল ভারি জুতো বিশিষ্ট লাঠি হাতে খুদে ভবঘুরেটিকে তিনি দেখেছেন বিত্তহীন, ব্যর্থ প্রাণ ধুঁকে ধুঁকে মরা প্রতিটি মানুষের মধ্যে— রাস্তায় অগনীত মানুষের ভীড়ে। 'দ্য গোল্ড রাশ'-এ ক্ষুধার তাড়নায় তিনি বুট জুতো সিদ্ধ করে খাচ্ছেন আবার মোমবাতিও। তিনি মনে করতেন চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় কাজটি করে অভিনেতা। তিনি নিজে অভিনেতা তো বটেই তাঁর ছবিতে কাহিনী, পরিচালনা, সম্পাদনার মত প্রয়োজনীয় বিভাগ-গুলিও নিজেই দেখাশুনা করতেন। তার ওপর মূকাভিনয় শিল্পটির প্রতি তাঁর দুরন্ত কৃতিত্ব থাকায় ছবি সবাক হবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি। তাই ১৯২৭ খ্রীঃ যেখানে ছবি প্রথম সবাক

হয়েছে সেখানে তিনি ১৯৩৯ পর্যন্ত নির্বাক ছবি করে গেছেন। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আইজেনস্টাইন তাঁর ছবিকে বলেছেন, এ যেন শিশুর চোখে দেখা জগতের প্রতিবিম্ব। এই ভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সার্থক জীবনশিল্পী।

চার্লি ছিলেন সেই মানুষ যিনি জীবনের দুঃসহ বেদনার পটভূমিকে শিল্পরূপ দিতে পারেন "হাস্য মুখে অদৃষ্টকে করবো মোরা পরিহাস"। চার্লি দীর্ঘজীবী ছিলেন, ১৯৭৭ খ্রীঃ ২৫ ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। তাঁর কালজয়ী ছবিগুলি তাঁকে চিরজীবন দান করেছেন। তিনি উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও কল্যাণমূলক সংস্কারবাদকে ভালোবাসতেন। আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে তার স্পষ্ট উচ্চারণ: 'I am for the working class', মৃত্যুর আগে রাণী এলিজাবেথ্ কর্তৃক "নাইট" উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। কিন্তু আজও এই জন্ম শতবর্ষে প্রগতির সেই মহান ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের অস্তিত্ব সমান তালে এগিয়ে চলেছে লাইম লাইটের প্রৌঢ় ভাঁড় কালভেরোর সেই মহৎ উপলব্ধি নিয়ে Life goes on and that is Progress সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্বের পরিমাপ করবো—শতবর্ষে এটাই হবে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

"সমাজ সচেতন দরদী শিল্পী চ্যাপলিন তার কমেডির মধ্যে মানবিক আবেদন এনে ফেললেন। ·········কথার আশ্রয় না নিয়ে কেবল সূক্ষ্ম অভিনয়ের সাহায্যে কিভাবে মানুষের মনের ভাব ক্যামেরার সামনে ব্যক্ত করা যায় এ নিয়ে চিত্র—রচয়িতারা আজ এই সবাক যুগে ও সর্বদাই চিন্তা করেন।"

—সত্যজিৎ রায়

সত্যি কি নেলসন ম্যাণ্ডেলা মুক্তি পেয়েছেন ?

স্বাতন্ত্রা ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ কলা বিভাগ

"........হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে ?

আফ্রিকা—যার প্রতি ধূলিকণাতে রক্তের দাগ, যার আকাশ বাতাস জুড়ে শিকলের ঝনঝনানি, বিশ্বের কাছে যে বঞ্চিতা, চির উপেক্ষিতা, সেই অরণ্যক আফ্রিকামায়ের কোলে জন্ম নিয়েছিল এক দুর্দান্ত প্রতিবাদের ভাষা—নেলসন ম্যাণ্ডেলা। জন্মক্ষণ থেকেই এই জননীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তার সম্পদ, তার শিশুদের ঘামে ভরা, রক্তে রাঙা সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে ঐ সাদা চামড়ার বর্বর মানুষগুলো। তাই প্রতিবাদের প্রথম সুরে সেই বর্বরেরা তাদের চাবুক হারানোর গান শুনতে পায়, শুনতে পায় মার্কসের মহাধ্বনি, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রভুত্বকারী ও পদানতের সংগ্রামের ইতিহাস, যেখানে প্রভুত্বকারী শক্তির বিনাশ ঘটে এবং অপর শ্রেণী প্রভুর পদে আসীন হয়। প্রতিবাদের ভাষাকে স্তব্ধ করার জন্য প্রভুর দল ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে যার কথায় আফ্রিকার কালো মানুষগুলো আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল, যার ভাষায় তারা নতুন সমৃদ্ধিময় জীবনের স্বপ্ন দেখছিল শ্বেতকায় সরকার তাদের নোংরা স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিনা বিচারে সেই অসাধারণ মানুষটাকে বন্ধ করলো কারাগারের চার দেওয়ালের আবদ্ধে।

কিন্তু কালের চাকা থেমে থাকবার নয়। বিপ্লবকে কখনও কারারুদ্ধ করে রাখা যায় না। যে মানুষটা বিনা প্রতিবাদে বহু বছর অত্যাচার সহ্য করেছে, তার মুক্তির দাবীতে সারা পৃথিবী সোচ্চার

হয়ে উঠলো। সেই চাপের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হল সেখানকার শ্বেতকায় সরকার, হার মানলো পুঁজিপতি শক্তি, জয় হল শৃঙ্খলের। নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তি সারা পৃথিবীর মানবতার ইতিহাসে সৃষ্টি করলো এক নতুন অধ্যায়—জন্ম দিল এক নবজাগরণের, নব চেতনার, সৃষ্টি হল এক নতুন আফ্রিকা—সুন্দরী আফ্রিকা।

নেলসন ম্যাণ্ডেলার অপরাধ ছিল তিনি কালো হয়েও সাদাদের কাছে অধিকার দাবী করেছিলেন, শ্বেতকায় আত্মদম্ভী, অহঙ্কারীদের কাছে মানবতার বিচার চেয়েছিলেন, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন বর্ণ বৈষম্যের স্রষ্টার কাছে। যদিও আজ বিভিন্ন ধরণের চাপের কাছে নতি-স্বীকারে বাধ্য হয়ে নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁর দাবী অনুযায়ী বর্ণ বৈষম্যকে কি রোধ করা হয়েছে বা চেষ্টা করা হয়েছে রদ করার? অতি আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতেও বর্ণ বৈষম্যের ব্যাপক প্রচলন আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। শ্বেতকায় জাতিরা বিশেষতঃ ইংরাজরা চিরদিনই নিজেদের অন্যের থেকে আলাদা করে দেখে এসেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে—ভোগ করেছে সেখানকার সব সম্পদ। তাই আজ, এই ১৯৯০ সালেও তারা সুনীল গাভাসকারের মতো বিশ্ববিখ্যাত, স্বনামধন্য ক্রিকেটারকে লর্ডসে ঢুকতে বাধা দেয় বা প্রেসবক্সে শ্বেতকায় সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট আসন রেখে দেয়। একজন নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তি বা কোন পদানত দেশের একাংশকে স্বাধীন করে কি এই বৈষম্য দূর করা যাবে?

কিন্তু শুধু শ্বেতকায়দের দোষ দিয়েই বা লাভ কি? আসলে বর্ণ বৈষম্যের ধারণা আমাদের মতো কালো চামড়ার মানুষদের সমাজেও প্রবেশ করেছে, তা পৌঁছে গেছে সমাজের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা খুললে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল 'পাত্র-পাত্রী চাই' এর বিজ্ঞাপন। আর 'পাত্রী চাই' এর বিজ্ঞাপনের একটা বহুল প্রচলিত ভাষা হল—'সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৌরবর্ণা পাত্রী চাই।' এই যে গৌরবর্ণা পাত্রীর দাবী তা দেখে কি বর্ণ-বৈষম্যের সপক্ষে আমাদের মনোভাব প্রমাণ করে না? কই আজ অবধি তো আমার কোন দিনও চোখে পড়ল না যে 'কৃষ্ণ বর্ণা' পাত্রী চাই। সুতরাং শ্বেতকায়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই, বর্ণ বৈষম্য আমাদের মনের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। শুধু আমরা নই, পৃথিবীর প্রতিটা দেশই 'বর্ণ বৈষম্য' নীতিকে সমর্থন করে চলেছে নিজের অজান্তেই।

বর্ণ বৈষম্যকে সমাজ জীবনে প্রবেশ করানোর জন্য দায়ী প্রধানতঃ দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা। এ দুটোই আসলে সমাজের বুকে ক্যান্সার, যা সৃষ্টি করে আনুষাঙ্গিক আরো অনেক, অনেক রোগের। যার মধ্যে একটা বর্ণ বৈষম্য। দারিদ্র্য মানুষকে অন্য অর্থবান লোকেদের কাছে ছোট করে দেয়, হরণ করে নেয় তার সমস্ত স্বাধীনতা, হরণ করে তার নিজস্ব সত্তাকে, আর অশিক্ষা মানুষকে করে তোলে

কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভয়ভীত এবং অজ্ঞ। তাই বর্ণ বৈষম্যের ক্ষতকে পৃথিবী থেকে দূর করতে গেলে পৃথিবীর মানুষকে হতে হবে আরো উদার এবং সহনশীল। কারণ বর্ণ বৈষম্যের শেকড় যে পৃথিবীর সমাজজীবনের একদম অন্তরে প্রবেশ করে গেছে। তাই এর জন্য প্রয়োজন জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে শুধু সংগ্রাম আর সহানুভূতির। বর্ণ বৈষম্য দূর করতে গেলে শুধু একজন নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তিই যথেষ্ট নয়; সব রকমের বৈষম্য থেকে পৃথিবীর সব মানুষের তথা সব নেলসন ম্যান্ডেলাদের মুক্তি চাই। চাই বিদ্রোহের বিস্তার—

"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ? শুনছো উদ্দাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট,
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত আর পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত,
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিনপঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে ॥"

সার্বজনীন উৎসব কি সর্বজনের উৎসব ?

মৃন্ময় মুখার্জী
দ্বিতীয় বর্ষ বি. এস সি

প্রবন্ধের শিরনাম একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি সমাজ জীবনের প্রতিটি জীবন্ত অর্থাৎ সমাজ সচেতন মানুষকে দিচ্ছে জলন্ত ছ্যাঁকা। সার্বজনীন উৎসবের সংখ্যা যতই ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, আমরা ততোই আগ্রহী হয়ে উঠছি প্রশ্নের উত্তর পেতে। বর্তমান সভ্যতার কুড়ি ছুঁই ছুঁই উনিশ বছরের যুবক হয়ে পারলাম না নিজেকে গুটিয়ে রাখতে। তাই অনেকের সঙ্গে আমিও "উত্তরের" পথ ধরে শুরু করলাম যাত্রা। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। ফলে বহু জ্ঞানীগুণী মহাজনের বক্তব্য শুনেও যখন আশানুরূপ উত্তর পাইনি তখনই গিয়ে পৌঁছলাম এক "বিতর্ক প্রতিযোগিতার আসরে"। বিতর্কের বিষয় "সার্বজনীন উৎসব বন্ধ করা উচিত কিনা"। মনে হল এখানেই পাব আমার প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু বিতর্ক প্রতিযোগিতায় থাকে বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষ। সুতরাং প্রত্যেকেই আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার। নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়ে মূল্যায়নের চেষ্টা করলাম দুই দলের বক্তব্য।

দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন মানুষকে দেয় শ্রান্তি ক্লান্তি। মানুষকে প্রয়োজনের তাগিদে কাজ করতে হলেও, জীবনের একমুখী প্রবাহকে বহুমুখী করার জন্য প্রয়োজন উৎসবের। আর সকলের মধ্যে নিজের আনন্দ ভাগ করে একটি সার্বিক প্রশান্তি লাভ করাই হল সার্বজনীন উৎসব। উৎসব আনন্দময় এবং পবিত্র হলেও আমরা যতই তথাকথিত আধুনিক হচ্ছি, ততই আমাদের জীবন হয়ে উঠেছে উপকরণ বহুল এবং আমাদের উৎসব নাগরিকতার উৎকট অভ্যাসে তার মূল তাৎপর্য থেকে বিচ্যুত হয়ে একটা হুজুগে মাতনে রূপান্তরিত হচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ নামেও খ্যাত। অমুক পল্লীর পুজোয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। তমুকের প্রতিমার ঢাকের সাজের দাম পাঁচ হাজার, কোথাও বিসর্জনে দশটি ব্যাণ্ড এসেছিল, অতএব আমাদের পল্লীর পুজোয় তাদের টেক্কা দিতে হবে। প্রতিযোগিতার মনোভাবে সাধারণ মানুষের প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। ফলে একটি বৃহৎ অঙ্কের অর্থ ব্যয়ে আলোকমালা সজ্জিত পূজা মণ্ডপের ঝকঝকে প্যাণ্ডেলের চারপাশের অন্ধকারে যখন অনেকের দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে, তা নিশ্চই অনুষ্ঠানকে মাঙ্গলিক করে তোলে না।

আমরা মা কালীর খাঁড়ার কিনারে অনন্ত নিভন্ত চনমনে লাল আলোর রোশনাই দেখে মুগ্ধ হয়ে উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করি প্রশংসা করি মণ্ডপ অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম কারুকার্যের, প্রশংসা করি পুজা প্যাণ্ডেলের ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যকে। কিন্তু এসমস্ত আড়ম্বর সামলাতে উদ্যোক্তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা (যার অভিধানিক অর্থ—স্বেচ্ছায় দান, আধুনিক সংস্করণ অত্যাচারী জিজিয়া কর) সংগ্রহ করেন। ধার্যমূল্য না দিলে দাতার ভবিষ্যত অন্ধকার। তবুও মণ্ডপসজ্জার বাড়াবাড়ি এবং আলোর ঝলকানিতেই মুগ্ধ হয়ে আমরা ভুলতে বসেছি যে ব্যয়াড়ম্বরের সর্বস্বতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা প্রধানতঃ সার্বজনীন উৎসবে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন তাদের প্রতি অতি সহানুভূতির দৃষ্টি জ্ঞাপন করেও, আমরা সার্বজনীন উৎসবকে, তাদের বাঁচার অবলম্বন করে স্বীকৃতি পারি না। কারণ এই বেপরোয়া অর্থহীন অপব্যয়ের অর্থ জাতিয় সম্পদের ক্ষতি— অর্থাৎ দেশের অবনতি।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত জাতীয় স্বার্থে সার্বজনীন উৎসবের সংখ্যার হ্রাস ঘটাতে উদ্যোগী হওয়া। আর ক্ষমতাসীন সরকার আইন মারফৎ সার্বজনীন উৎসবে ব্যয়াড়ম্বর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ করলেই সার্বজনীন উৎসব পরিণত হবে সর্বজনের উৎসবে॥

শিক্ষার জন্য আমরা আব্দার করিয়াছি, গরজ করি নাই, শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইবো, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়াল নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো"

শংকর চট্টোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ/কলা বিভাগ

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান / বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান "এই চিরায়ত বাণীই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বারবার এই অখণ্ডতা, সংঘবদ্ধতাকে নষ্ট করতে চেয়েছে। যার সর্বশেষ রূপ আমরা দেখতে পেলাম সংরক্ষণের প্রশ্নের (মণ্ডল কমিশন প্রস্তাবিত) আন্দোলনে।

আবেগ স্পন্দীত, সৃজনশীল কর্মে নীয়জিত, প্রাণবন্ত উদ্যোম উচ্ছাস শক্তিতে বলিয়ান দেশের ছাত্র ও যুব সমাজ।

একটি দেশের অগ্রগতি অনেকাংশে এই মানব শক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বে আমরা জনসংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি। আমাদের মোট জন সংখ্যার ৩২ শতাংশ যুব সম্প্রদায়। স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরেও বেকারত্বের এই হাহাকার কেন? কেন দেশের ৪১ ভাগ মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধকারে? এর জন্য কি সংরক্ষণ নীতি দায়ী? কতিপয় স্বার্থান্বেষী শক্তি এই মণ্ডল কমিশন প্রস্তাবিত অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য ২৭ ভাগ চাকরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিরোধীতায় আবারও যুবসম্প্রদায়কে বিপথগামী করতে চাইছে।

সংরক্ষণ নীতি ভারতে আর্থ সামাজিক বর্তমান কাঠামোর মধ্যে থাকা জরুরী, সেই মতো মণ্ডল কমিশনের সুপারিশানুযায়ী সংরক্ষণ যুক্তিযুক্ত, কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলা উচিত যদি এই সুবিধা সঠিক লোকের মধ্যে পৌঁছে দিতে হয় তবে তার ক্ষেত্রে আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হওয়া উচিত। একটু তথ্য অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় যে কাজের ক্ষেত্র সংকোচনের যে ভয় ছাত্রযুবদের মধ্যে সঞ্চারিত তা অবাস্তব অমূলক। জাতিভেদ নানাদেশে কম বেশী থাকলেও এই প্রথার গভীরতায়, ব্যাপকতায় এবং কঠোরতার বিচারে ভারতে এই প্রথা যথেষ্ট স্বতন্ত্র, ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের মোট জন সংখ্যার ২৩ শতাংশ তপশিলী জাতি উপজাতি আর অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ৫২ শতাংশ (O. B. C.)। বর্তমানে এই তপশিলী জাতি উপজাতি গোষ্ঠির

মধ্যে কাজ করছে (সরকারী কর্মক্ষেত্রে) মাত্র ১৮.৭৫ ভাগ এবং অন্যান্য পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার ৫২ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও কাজ করছে মাত্র ১২.৬৫ ভাগ, আমরা এই ভাবে যদি দেখি যে মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ (আনুমানিক) জনসাধারণ তপশীলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। আর তাদের জন্য সংরক্ষণ মোট ৪৯.৫% এবং আওতার বাইরে ২৫ ভাগ মানুষের জন্য থাকছে ৪৯.৫ ভাগ কাজের সুযোগ। এই সংরক্ষণভুক্ত জনসমাজ শুধু শিক্ষা দীক্ষায় এবং অর্থ নৈতিক মানদণ্ডের বিচারেই এরা পশ্চাৎপদ তাই নয়—সামাজিক ব্যবস্থায় এঁরা চরম অবিচারের শিকার। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ মানুষকে এখনও চরম অমানবিক অস্পৃশ্যতার গ্লানি সহ্য করতে হয়। তাই ১৮৮৫ সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বর্তমান। "সকলের জন্য সকলে "আমরা" এই মানসিকতার কার্যকারিতার দ্বারাই আমরা এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিকে পারবো শিক্ষা ও স্বচ্ছলতার আলোকোজ্জ্বল করতে।

সরকারী চাকুরী দিয়ে আমাদের দেশে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ জন্য দেশকে শিল্পায়িত করতে হবে ও দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে প্রথম শর্তই হ'ল আমূল ভূমি সংস্কার, তবেই দারিদ্র দূর করা সম্ভব এবং যার হাত ধরে আসবে শিক্ষার আলো, অস্ত যাবে কুসংস্কার। এই মানুষ গড়ার আন্দোলন থেকে সুকৌশলে ছাত্র শক্তিকে দূরে সরাবার এক কূট অভিসন্ধি এই সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন। স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় আপাত চাকচিক্যময় এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ছে ছাত্র সমাজ। অথচ এ দেশের মৌলিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণতো এই যুবসমাজকেই করতে হবে, সমাধানের সঠিক নিশানায় লক্ষ্যভেদ করতে তাদেরই তো পার্থর ভূমিকায় অবতির্ণ হতে হবে। তাবং সমস্যায় জর্জরিত জনসমাজের সামনে সুধা হরণের, ক্ষুধা ভরণের যে উদাহরণ বর্তমান তাকে ক্ষুধা হরণের সুধা ভরণের উদাহরণে পরিবর্তিত করতে হবে। এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় বর্তমানে সংরক্ষণ শুধু অক্ষুণ্ন রাখাই নয়—তাকে আন্তরিকতার সাথে কার্যকরী করতে হবে। যারা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে তাদের যেমন বোঝানোর দরকার যে সংরক্ষণই শেষ কথা নয় আবার যারা মনে করেন সংরক্ষণই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি—তাদের কেও ভুল ভাঙিয়ে বলতে হবে যে সংরক্ষণে সকল সমস্যার সমাধান অসম্ভব—যুব সম্প্রদায়কেই এই ভুল ভাঙানোর দায়িত্ব নিতে হবে।

এই কাজের মাধ্যমে আমরা পারবোই আমাদের সংঘবদ্ধতাকে বজায় রাখতে। আমরা আবার বলতে পারবো—

"ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"

অধ্যয়নং তপঃ

শাশ্বত সেন
একাদশ শ্রেণী বিজ্ঞান

ছাত্রজীবনের কর্তব্য কি ?

অধ্যয়ন অধ্যয়নং তপঃ। পুরাকালে মুনিঋষিরা তপোবনে বসে কঠোর তপস্যা করতেন। ছাত্রদেরও সেই রকম কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। মুনিঋষিরা থাকতেন তপোবনে, নগর জীবনের সমস্ত কোলাহল আকর্ষণের বাইরে—নির্জনে। ছাত্রদের অধ্যয়ন করতে হবে শহর জীবনের সবরকম কোলাহল ও আকর্ষণের মধ্যে। মন তপস্যায় বসানো বড় কঠিন কাজ।

পাশের ঘরে টি ভি চলছে। চিত্রহার, বাড়িশুদ্ধ সবাই কাজকর্ম ফেলে হাঁ করে দেখছে। ছাত্রের সেখানে যাওয়া নিষেধ। তাকে পড়াশোনা করতে হবে। কানে যদি গানের কলি ঢোকে—কানে তুলো গুঁজে রাখ। তাকে যে পড়াশোনা করে বড় হতে হবে—এসব লঘু আকর্ষণে মন দেওয়া চলবে না।

স্কুল থেকে ফেরার পথে পাড়ার ছেলেরা কাদা মাঠে দুমদাম ফুটবল পেটাচ্ছে। ছাত্রের মন চঞ্চল, একটু খেলব ? সারা গায়ে কাদামেখে ধাঁই ধপাধপ বলপেটানো—কি মজা! কিন্তু অসম্ভব। অভিভাবকের কড়া শাসন। পা ভেঙে বাড়ি ফিরবে। পড়াশুনা বন্ধ - স্কুল কামাই, অতএব স্কুল থেকে ফিরেই হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসো। নয়ত ছোটো কোচিং ক্লাসে।

আমি মারাদোনা হব। পেলে হব।

হাঁ, পেলে হব! আমাদের দেশে ওসব হয় না ওসব ওদের দেশে হয়। আমাদের দেশে শুধু পড়াশোনা কর। একে টপ্‌কে তাকে টপ্‌কে ওপরে ওঠ।

প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় জিততে হবে। ছাত্র জিতলে অভিভাবকের সম্মান—শিক্ষকের সম্মান। হারলে সামনের বাড়ীর রকে বসে—জীবনযুদ্ধে জয়ী, সফল মানুষদের মিছিল দেখ। অতএব ছাত্রজীবনে শুধু অধ্যয়ন আর কিছু না।

কিন্তু মন তো একথা মানে না। ইচ্ছে করে পেলের মত—মারাদোনার মত ফুটবলের জাদুকর হতে। সোবার্সের মত, ব্র্যাডম্যানের মত ক্রিকেট খেলতে। অন্ধকার সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতে দূরে। যেখানে হাতছানি দেয় লাইট হাউসের আলো। ডুবুরি হয়ে সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে। অন্ধকার গুহায় ওঁৎপেতে আছে ভয়ঙ্কর অক্টোপাস। হাঙর ঘুরছে সুযোগের অপেক্ষায়। ঝিনুকের মধ্যে উঁকি মারছে মুক্তো। অথবা এরোপ্লেন নিয়ে উড়ে যাই অনন্ত আকাশে। পাহাড় ডিঙিয়ে—মরুভূমি পেরিয়ে চলে যাই দূর-দুরান্তরে। হয়ত কখনো ভেঙে পড়ল প্লেন অজানা কোথাও—খবর নেই—সবাই ভাবছে বুঝি মরেই গেছি। তারপর একদিন ফিরে এলাম। কাগজে কাগজে কি হৈ চৈ।

পৃথিবী জুড়ে কত রহস্য – কত বিস্ময়। মন চঞ্চল হয়।

এডভেঞ্চারের নেশায় চার দেওয়ালের গণ্ডী ভেঙে শাসনের শৃংখল ভেঙে উদ্দেশ্যবিহীন ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু না এসব ভাবনা আমাদের জন্য নয়। আমরা ছাত্র। আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা করে একটা ভালো চাকরি জোটাতে হবে—চাকরি না পেলে খাওয়া জুটবে না। আর এই না এর বহর এত বেড়ে যাবে যে কল্পনার রঙিন ফানুসটা এক মুহূর্তেই চুপসে যাবে।

তাই শুধু অধ্যয়ন। আমাদের দেশের ছাত্রদের জন্য শুধু অধ্যয়ন। এসব ভাবনা ভাবতে পারে ওরা—ওদের দেশের ছেলেরা।

সেটা কোন্ দেশ ?

সে কোন্ দেশের ছেলেরা ? তারা কি ছাত্র নয় ?

পড়ার বইয়ে মুখ রেখে তবু কল্পনার ফানুস তৈরী করি—রং করি আঠা লাগাই। ওড়াতে পারি না।

আমি এদেশের ছাত্র। আমার জন্য অধ্যয়নং তপঃ।

আর্ট হচ্ছে জনসাধারণের জিনিষ। শ্রমজীবি জনগণের মধ্যে একে গভীরভাবে শিকড় গাড়তে হবে। এমনভাবে গড়তে হবে যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে। পছন্দ করে।

ভি আই লেনিন

যুগলবন্দী

অমল চক্রবর্তী
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক

১. স্তব্ধ মৌখল

তোমার যে মুখে আজ গর্ব নামছে ঢলে ঢলে
তার তলে থুবড়ে আছে করুণ কাঠামো।

শুধু গন্ধ আজ ভুবনপালকের, আর কিছু নয়
শুধু মুদ্রা আজ অন্নদাতার

শেষ পর্ব দূরে, কিন্তু এখনি তো জ্বলেছে খুলি
পাতালগমনে উড়ছে সুন্দরের ছাই

২. পালক

আমার কপাল জুড়ে আছড়ে পড়ছে
তোমার পায়ের বরাভয়, আর
আমার মাকে ধর্ষণের চিহ্ন নিয়ে
কত বড় আরো বড় হয়ে উঠেছ তুমি

তুমি আমাদের পালক
এক মুঠো ভাত এক টুকরো রুটি দিয়ে
বদ্‌লে নাও আমাদের হৃৎপিণ্ড ফুসফুস

আমি ফুরিয়ে চলি, যেতে যেতে
দেখি তোমাকেই, আজো কোনো
দেবতা আসেনি আমাদের সংসারে
আমাদের নিজেদের দেবতা নেই

শুধু, তুমি আর তোমার ধ্বংসের বাহার

ছড়া

অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত

এক

নিজেকে বহন।
নিঃশেষ দহন॥

দুই

ব্যাথাটাকে
যত্ন ক'রে
রেখে দাও।
নিন্দে করলে
সৃষ্টি যে
লজ্জা পাবে॥

তিন

কী হবে বসে থেকে
মৃতদেহ আগলে,—
কাক চিল শকুনেরা
ভাগাড়েতে ভাগলে,
নেমে আসে ঝুপ ক'রে
রাত্রির গাঢ়-টা—
দূরে কোন গীর্জায়
ঢং ঢং বারোটা॥

দুটি কবিতা

অধ্যাপক কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্য

(১)

মনে রাখা যায় পাশাপাশি ব'সে
মোটরে খানিক আসা—
মনে রাখা যায় পায়ে পায়ে ঘাসে
চলে ফিরে ভালবাসা।
মনে রাখা যায় ছেড়ে আসা দূর
হোটেলের জান্‌লাকে,
মনে রাখা যায় প্রেমের চিঠিকে
নিয়ে পান্থবী আন্‌লাতে ॥

মনে রাখা যায় লোডশেডিং-এর আঁধারে সহসা দীপ
মনে রাখা যায় মৃতাবান্ধবী কপালে আকাশে টিপ ॥

মনে রাখা যায় ধার দিয়ে শোধ
না পাওয়া কত যে টাকা
মনে রাখা যায় ধানকেটে নেওয়া
মাঠে কত দূর ফাঁকা।
মনে রাখা যায় যন্ত্রণা দেওয়া
ডিস্‌কোর ঝন্‌ঝনা
মনে রাখা যায় গৃহিনীর কাছে
রাত ক'রে বাড়ী ফিরে এসে গঞ্জনা ॥

(২)

মোটর থামিয়ে শেষ কথা বলে গেলে
'আবার আসব' কিন্তু কোথায় এলে ॥
বৃষ্টি থামেনি তবুও তোমার আশায়
পিছল পথের অনিশ্চিতের ভাষায়
সেই সে শপথ শুয়ে থাকে মুখ বুজে
আমি বসন্তে বৃথা মরি কারে খুঁজে।
কান পেতে শুনি হর্ণ ধ্বনি বাজে আর
আহ্বান কার কাচ ভাঙ্গে চুরমার ॥
কিন্তু কোথাও সাড়া নেই শুধু হাওয়া
রবি ঠাকুরের গান ফিরে ফিরে গাওয়া
হিন্দি ছবির প্রলাপের মত প্রেম
ছবি ছিঁড়ে গেছে ভেঙ্গে গেছে তার ফ্রেম ॥
অনাবাদী রাত হতাদর তার চাঁদ
ফোঁটা ফোঁটা তারা কার যেন কত সাধ
সব ছুঁয়ে থাকে টায়ারের মোছা দাগ
গালের দুপাশে রাঙা ফাগুনের ফাগ ।।
মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা তোমার হাত
শেওলা ধরানো ভাঙা আলশের ছাত
কলকাতা যেন কোলাহলে মরে আছে
দোকান বস্তি দূরে আর ঢের কাছে ।।
এ কেমন মেঘ বিদ্যুৎ হারা বুক
এ কেমন দিঘি জল হারা পচা পানা
আশায় আশায় অফলন দিন গোনা
দুখের উনুনে নেভা কয়লার সুখ ।।

Ripples of Remembrance

RUPA SEN
2nd yr. B.A. (Eng. Hons)

The day has come when the
sunshine is boring
And things around me is not the same.
I strain my ears to hear a distinct call.
A friend who was so near to me
But alas ! I only see the petals
drooping in dismay.
Oh ! to be in the primordial womb
of the eternal dark.

Put on your thinking caps—

1) Some days are rainy,
Some days are fair—
Friday comes before thursday
where ? ? ?

Ans—Dectionary

Where are the Little Girl's Gone ?

Papia Ghoshal
B.A. 2nd yr. (Pol Sc. Hons)

They are born girl's
It's their sins
The trouble here begins

They are running they are screaming
They are burning they are crying
Yet they are shut !

But for what ?
Because of the fact
They are none
Where they have gone ?
Their louder screams
Bring back their ruins
Their screams get mix
With the noise of the shore
Underneath the scream seems
Just a fatal noiseless roar

Society is without any motion
Except on the verge of election
It never bothers
'Cause the girls are slayed down
By their own mothers !!
They are none
Where they have gone ?

LIFE

Sumit Mitra
B Sc. A. Stats (Hons)

I thought life to be a well harvested field
Where golden grains swayed to and fro
and love is like the long awaited rain
for which the farmer has nothing to do but wait

I thought life to be a dutch windmill
working of which produced food for the mind
Where love is like the swelling wind
without which life will be stranded in the
middle of nowhere.

I thought life to be a Shakesperean sonnet
which receivedd acclaimation with
passage of time
Where love is like Van Gogh's pictures
Whose lustre grew over sands of time.

I thought life to be an oasis
where people would come to quench their thirst
but it turned out to be a desert
where love is nothing but a mirage.

Put on your thining caps—

2) What is it that belongs to you
but your friends use it more
than you do ?

Ans – Name

Pleasures and Problems of Living in a Large Family

Urmi Dutta
2nd yr. B A. (Hons)

There are various plus points which can be recorded in favour of living in a large family. Although constraints are no less. It is a million dollar question whether to live in a large family or not

By large family we however mean a joint family in which people of various age groups starting from grandfather or grandmother and ending with grandson or grand-daughter live together under a common roof while making use of a common kitchen Members are bound together with menship marital & legal ties. Such a style of iiving fosters adoptability members are used to adjust themselves to the varying claims and demands of the ever-increasing joint family.

Generally the head of the family is the senior most member who rigns supreme in all mothers, usually the grand father in a patriarchal type of society governs the family with his decisions For example, grown up sons abide by the decision taken by their father or matter. Different members of different income ranges try to live harmoniously and their children are brought up under common guidance Mentual help to each other is the most important tactor in a large family although shirmishes often erupt, angry outbursts only strengthen the tie among the members and never sound like broken chords. Discords exist but only to be resolved happily. Parents ful less constraint in bringing up their children as other members extend their

helping hand in doing so. The bliss of living in a large family his in the atmosphere. Sense of less pain, anxiety or excess—all are absorbed in congenial atmosphere which is vital especially for the children. For they are not seif-centred as the modern babies are. The entire family works as a team and as such in trying conditions are doesnot ful helpless The pleasure of living in a large family is great although the problems are not felt The crus of the problem is that one has to work within a larger framework ; his personal likes and dislikes have little importance in the general scheme. One has to sacrifice manythings against his will. There are many other problems besetting life in a large family and by the test of time large families are being reduced in number gradually and steadily.

THINK POSTER

You will always succeed, if you think success ; May be not the first time. but next time its surely your game, Inspite of all its ups and down, life is still worth living ; No matter, how difficult the goal may seen. you shall not give up fighting Your duty is to work, and not to worry about the fruits ; For it you'd toil hard enough, the results will surely be good. But if you fail to achieve your goal, don't lose heart or give up hope, But try again till you are sure and this time put your heart and soul You will surely come out a winner if you remember this saying for end : that, "Failure is the pillar of success", and one day you will be the best.

By—

RIMA BOSE
Hons. Political Science
2nd year

THE DEATH BEAM

Atanu Mukherjee
Class—XI Sec. B/Sc

It was late night, the chilling cold wind was creeping through the capital of India, the streets were bare, the world seemed to be in their eternal sleep, there on the footpaths lay the outcaste of the society, the homeless children. They lay with their limbs folded, heads lowered near their knees, they don't know that they had the right to survive, that they are also human beings and not the creature of hell.

Children are born, the poets say, trailing clouds of glory, theirs is a sheltered and blameless time, a sweet paren thesis between birth and responsibility. The young are expected to play, to learn, to feel life in every times. They are not supposed to head towards an evil death' But that is happening, unavoidably, in the third world countries, where Its been a curse—that their children, a palt of the fu ure genera ion are brought up on streets, where mostly crime is their only means of survival.

"They rove in gypsy bands, sleep in construction pipes, in rat infested cellars of abandoned buildings or in street corners in miscable heaps. Their beds are torn newspaper their clothings mare scraps of cloth Th ir d ys are spend in hustling, prostitution and pretty crime. They pray upon each other as well as the passers by". They are the street children, supports the Time Magazine'

These creatures went on begging from door to door, as they have no other alternative in the bitter, filthy struggle for survival. Dozons lay side by side in some corners shivering with cold, in some chilly nights, their empty stromach aiking, with hunger, their minds semi concious, agitative, their eyes drawsy, and at that pityful, halfdead condition seeds of crime are to be sawn The number of these children is quite alarming—near about 40 million worldwise.

The number of such children in India is also quite shocking. They roam about the ditched roads, anxious and hopeful to earn some money, even late at night They ara not particularly eager to stop as streets are their home, and everything. When tired, exhausted they lie on streets or on benches of some parks. The babies also loiter, in the laps of their mother, defient and crying from the constant burns of hunger. They are also children provided with no security, no shelter, no food, no way out of their street existance. They are a little better that just street dogs. But they too ranging between 4—12 years are seen to hunting ior food among heaps of garbages They picks up scraps of paper, and bits of

things as their toys, they eat perished food to meet their hunger.

According to UNICEF (United nations International Children Emergency Fund), 60 percent of the homeless children between 7—18, years of age, uses hallucinatory substances, 40 percent uses alcoholic bevarages, 16 percent are drug addicts, and 92% use to bacco. Since they had god no marketable skills, they often survive by begging, standing ar mare prostitution. Growing up as 'no-body's children,' they are in danger of becoming out laws, and out laws-are the threat to the security of any community.

It is not however easy to help these homeless children out of the street den. Being brought up on streets for some years, they deny to be brought up at any orfan home. The hunger that they had suffered from, in years, adiquate food cannot derive that out. They have seen the ignorence of the society. they have pereceived the evils of street life. Their lurching way of survival, made them just bludger, as may appear from a distant blink. Their spirit had now blurted violently against society. Now-they fill its better off by him self even on streets. But through ages thay have been deceited and deceived by the society. Its not food, Its not shelter they ara searching far love, a little pity on them. James Grant, the executive director of UNIC F, in one of his article ' Kids and Tomorrow" stated : "By the age of 3 and 4 years 90 percent of the persons brain cells are already linked, and physical development is advanced to the point where pattern is set, for the rest of the person's life. Those early years there fare cry out of protection, both to protect the childs right to develop to its full potential and to invest to the development of the people so that they can more fully contribute to the well being of his/her family and nations".

No body wants to adopt a street child. Who would want to help a youth who had grown up without direction and discipline. Some of the children who are roofless are asked about their past. A very few however dare to talk. Those who cant to brate the hunger, picks up teenagars wrist watch, attack the aged, or snatch away the women's purse or neckless. Its not that they have chosen this means of survival, they have been made to do so by sevaral gangs of behind the curtain burglers'. These children leads every day as if it is his last.

Talking to Abdul, a ten years old by, begging on a platform, he stated that his mother died when he was a mare baby. At the age of seven, his drunken father kicked him out of the house and sin e he just live on beggins. Sukhia is also at his teens. He earns his livelihood by washing the glasses of the cars that is trapped in a jam. He is an orfan, and says that he cares on one. These are the children we need to be

concernea for. The government of some countries are trying to sought a way to this problem However, no sceam had proved to be very successful, till now. Those who had lasted the evils of free life on street, deny to be in any type of custody, according to their opinion.

THE U N. DECLARATION OF THE RIGHT OF THE CHILD :

1. The right to a name and nationality.
2. The to affection, love and understanding and to material security.
3. The right to special care if handicapped, be it physically, mentally or socially.
4. The right to adequate nutrition, housing and medical services.
5. The right to be among the first to receive protection and relief in all circumstances.
6. The right to be protected against all forms of neglect, cruelty and exploitation.
7. The right to full opportunity of play and recreation, and equal opportunity to free and compulsory education, to enable the child to develop his individual abilities and to become an useful member of the society.
8. The right to develop his full potential in all conditions of freedom and dignity.
9. The right to be brought up in a spirit of understanding, to friendship among peoples, peace and individual brotherhood.
10. The right to enjoy these rights regardless of race, colour, sex religion, political or other opinion, national or social origin and property birth or other states.

The outstreched hands of a soulful looking waif can tug your heart. In order to feel less quilty, some people drop coins on their palms and quickly walk away. But this hand out is mostly not spent on food or shelter. Rather it may well end up being used to buy drugs or alcohol as for smoking. So some civic minded adults are suggested to help the local government sponsored programmes who wants to assist these homeless children. In this way, the problem can be solved to an extent.

It is without any doubt that the poor economy in many countries is responsible for the increasing number of homeless children. But effection can well separate them from the path of crime. They have the rights to be brought up in all circumstances. Thousands dies in the world out of cold hunger—malnutration, yet no one to care no one to see, no one to love. Who are to be blamed for their condition ?

"স্মৃতি সতত সুখের"

বর্ষব্যাপী প্লাটিনামজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ সম্পাদকের বক্তব্য

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে অনলস চেষ্টা চালিয়েছেন, তারই অন্যতম ফলপ্রাপ্তি এই আশুতোষ কলেজ।

আমরা গর্বিত, আমরা এমন এক কলেজের বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি যে কলেজ আশুতোষ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশের শিক্ষাজগৎ ও চিত্তজগৎ আশুতোষের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা এই শ্রদ্ধেয় অসাধারণ শিক্ষাবিদের কাছে ঋণী। এই মহাবিদ্যালয়কে ভিতরে বাইরে সমাজের পক্ষে উপযোগী করে তুলে ঋণপরিশোধে আমরা সচেষ্ট।

কলেজে পঠন-পাঠনের অনুকূল ও উন্নত পরিবেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হয়েছি। কলেজের পরিচালনায় ও পরীক্ষার ফলাফলে, খেলাধূলায়, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে, ছাত্রছাত্রীদের আচার-ব্যবহারে এই সাফল্য প্রতিফলিত। এই কলেজে ১৬টি বিষয়ে সাম্মানিক ও ২০টি বিষয়ে সাধারণ শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। কলেজীয় অধ্যয়ন শেষে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানে যাতে কিছুটা সাহায্য হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা কম্প্যুটার কেন্দ্র খুলেছি এবং কর্মসংস্থানে সাহায্য হবে, এমন আরো কিছু বিষয়ে অধ্যয়নে ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছি।

সমাজে বিদ্যমান হতাশা বোধ, অনিশ্চয়তা বোধ ও অনিষ্টকর পিছুটানের শিকারে পরিণত হচ্ছে ছাত্ররা। এই প্রতিকূলতার মধ্যেও যদি ছাত্রদের মনে একটা কিছু সম্ভাবনার আশা জাগাতে পারি, ভরসা দিতে পারি, কাম্য মূল্যবোধ রক্ষায় আকৃষ্ট করে, আমরা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী হিসেবে স্বস্তি পাব।

এই কাজে আমরা অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের সাহায্য কামনা করেছি। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্রদের সাহায্য চেয়েছি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে এ-রাজ্যের ব্যাঙ্ক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছেও সাহায্য চেয়েছি। আমরা আনন্দিত, অভূতপূর্ব সাহায্য আমরা পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সমবেত শিক্ষানুরাগী হিতৈষী অভ্যাগতদের কাছে কলেজের ও প্লাটিনাম জুবিলি কমিটির পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রাক্তন ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের কাছে।

আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয়কে অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।

জুলাই ১৭, ১৯৯০

শস্য-জাতক

প্রেমেন্দ্র মিত্র— প্রাক্তন ছাত্র

মাঠের শস্য গৃহে এল—
তার স্তোত্র রচনা কর কবি।
মানুষ ও পশু আনন্দের বোঝার ভারে নত হয়ে এল
গৃহে ফিরে,
মরাই বোঝাই হ'ল।
মানুষ আর একবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে
পূর্ব্বে ও পশ্চিমে
উত্তরে ও দক্ষিণে
ভারতে…ফ্রান্সে…নীল নদীর তীরে…কানাডায়।

মৃত্তিকা মানুষকে অর্ঘ্য দিলে।
কেউ দিলে মমতায় মাতার মত আপনা হ'তে,
কেউ অনিচ্ছায় কৃপণের মত মানুষের পীড়নে ;
…সলজ্জ প্রিয়ার মত কেউ ছিল গোপন
একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

তবু সব মৃত্তিকাই দান করলে :—
মরুপ্রান্তের নির্মম বালুকা, আর
উচ্ছলিত-সুধা নদীকূল-ভূমি
গিরি-বেষ্টিত উপত্যকা আর দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তর
কালো ও রাঙা মাটি
কঠিন ও কোমল
যুবতী ও বৃদ্ধা।

(১৯৩৮ সালের পত্রিকা থেকে গৃহীত)

দিনান্তে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোন দুর্দান্ত ডাকাতের মত
রাস্তায় মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল
সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পর সরজমিন তদন্তে
দিনকে রাত করতে
যেন পুলিশের কালো গাড়ীতে এল
সন্ধ্যা,

আলোটা জ্বালতেই
জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল
অন্ধকার।

পর্দাটা সরাতেই
ভয়চকিত হরিণীর মত আমাকে জড়িয়ে ধরল
হাওয়া॥

(১৯৫৭ সালের পত্রিকা হইতে গৃহীত)

মেঘতত্ত্ব

সামসুল হক
তৃতীয় বর্ষ ॥ সাহিত্য

অরণ্য-নিবিড় স্বাদ বেদনার নীলে,
কতো ভাল : কতো ভাল তোমার আমার
পাহাড়-চোখের নদী। নিভৃত দুয়ার
খুলে রেখে বুক ভাঙি—অপরূপ মিলে।

এই শেষ : শেষ মাটি জড়িয়ে দু'হাতে,
শেষ সাধ পূর্ণ ক'রে কেঁদে যাবো রাতে ॥

(১৯৫৭ সালের পত্রিকা হইতে গৃহীত)

দু'দণ্ডের অপেক্ষায়

উৎপল কুমার বসু

শেষ হলো মেঘের সঞ্চিত জল।
মাঠে মাঠে এখনো চঞ্চল
দু'একটি জলের ছোটো ক্ষণিক পৃথিবী
জানো, কোন শূন্যতার থেকে
ফিরে এলো প্রেমিক যুগল ?
সিক্ত মেঘ দেখেছিলো ঐ ঘন বনের আড়ালে
দুজনার সম্মুখে দুজন।
অদূরের যত বন
আবার বৃষ্টিতে যদি ঢেকে যায়
তুমি ভাবো ওপারেই শূন্যলোক
তুমি ভাবো তারা কেন শূন্যতার অভিমুখী।

(১৯৫৯ সালের পত্রিকা হইতে গৃহীত)

বেতার : ১৯৪৩

শ্রীদীনেশ দাস
প্রাক্তন ছাত্র

এক দেহে হল লীন
সাইগন-বার্লিন।
রাতের বেতারে
ছড়ালো এক মুঠো মুঠো কাঁচা প্রাণ ইথারে ইথারে।
মুমূর্ষু ভারত জাগে
বিস্তীর্ণ ভূভাগে
জ্বালে দীপ
যবদ্বীপ
ইন্দোনেসিয়ায়
এসিয়ায়।

ভূগোল
শুনেছে শুধু দুনিয়ার যত সোরগোল—
সাইক্লোন আসে যায় শতকের বাঁকে—
কে বা মনে রাখে !
পার হয়ে ইতিহাস-ভূগোলের সীমা
লণ্ডন স্টেলিনগ্রাড আর হিরোসিমা
অন্তরনিভৃতে লীন—
দেশহীন কালহীন সাইগন-বার্লিন।

আমার এ দিকে লাল বুদ্ধির মলাটে
সারাদিন ধুলো জমে দুপুরের হাটে,
বুদ্ধির উজ্জ্বল দিন নিভে গেলে, হলে একাকার,
পৃথিবীতে নামে যেই নরম প্রাণের অন্ধকার,—
তখন মনের খোলা আকাশেতে কার স্বর
উদাত্ত ভাস্বর—
অমলিন
সাইগন বার্লিন।

আকাশের কাছাকাছি,
তবু আজো কান পেতে আছি,
কোথায় শব্দের ঢেউ কাঁপে থরথরো—
এরিএল উঁচু করে ধরো ;
খোঁজ করো এই গ্রহ হতে গ্রহান্তরে
কোথায় শব্দের সোনা ফুল হয়ে ঝরে,
সোনার স্তবক খোলো খোলো—
এরিএল উঁচু করে তোলো।

(১৯৫৬-৫৭ সালের পত্রিকা হইতে গৃহীত)

বিবর্ণ রুমাল

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
প্রাক্তন ছাত্র

গাড়ী চলে গেলে উজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম থমথমে হয়,
জমকালো ভিড়, আর ফেরিঅলা পাৎলা হয়ে
কোথায় উধাও।

ট্রেনে তুলে দিতে এসে ফিরে যায় যারা
শুধু স্নিগ্ধ হাতের বলয়ে
রুমাল উড়িয়ে,
বিমর্ষ বিষণ্ণ এক নির্বোধ বিরহ
ব্যস্ত হয়ে হয়ে উচ্চকিত হয়:
যে যায়—সে যায়!
বুকের ভেতরে তার ট্রেনের দুর্দান্ত গতি
ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্
দূরের সংকেত গড়ে।
রুমালের সাদা পদ্ম দিগন্তে মিলায়,
টুপটাপ টুপটাপ দল খসে,
ট্রেন চলে গেলে ধূসর মন্থর কোন্
নিস্তব্ধতা বুকের নদীর তীরে বিরহ বানায়।
যে যায়—সে যায়!
আমি এই ট্রেনে গেলে
তোমার রুমালে গড়া
পদ্মের সৌরভ হয়ে হাতের বলয়ে
দেখো অচিরে মিলাবে।
ট্রেন চলে গেলে শুধু অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম,
স্মৃতিতে ধূসর হবে
পদ্ম আর বিবর্ণ রুমাল।

(১৯৬৮-৬৯ সালের পত্রিকা হইতে গৃহীত)

তোমার শতাব্দী ভেঙে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
প্রাক্তন ছাত্র

নিকটে, অনেক দূরে, ঝরে যায় বয়সের শেষ স্বাধীনতা।
আমি বেঁচে আছি কিংবা নেই এ দাবী প্রধান কণ্ঠে জানি একদিন
প্রশ্ন হয়ে ছুঁয়ে যাবে প্রতি শব্দ ধ্বনির জিজ্ঞাসা।

বছর বছর পরে কোন একদিন।

যে বিকাশ আন্দোলিত আজ ঐ অনিশ্চিত ফুলে
আমি তার প্রতিবিম্বে সমস্ত আকাশ ডেকে আনি ;
ডেকে আনি, কেননা এখন এই তমোহীন দৃশ্যের শরীরে
যত প্রিয় স্পর্ধা ভাবি সব ভাসে দক্ষিণ হাওয়ায়।
একদা কৈশোরবেলা প্রবল বিক্ষোভে আমি একা
প্রথম বিহগকণ্ঠ নক্ষত্রের তৃষ্ণা চিনে নিতে
তোমার শতাব্দী ভেঙে অকস্মাৎ চতুর্দিক আলোর বন্যায়
আমার যৌবন যেন দেখেছি ছায়ায় কাঁপে তোমারি অসীমে।
আজ পৃথিবীর এই অর্থহীন মর্যাদার পাপে
অন্ধতম অবনত মানবিকতার অভিশাপে
নিহত প্রেমিক আমি যত শব্দ লিখি — ঝরে, কবিতার তীর্থ সরে যায় ;

পারি না তখনো যেতে যুগের সংঘাত ছেড়ে অন্য কোন দ্বিতীয় আশ্রয়ে।

হে অমলিন রৌদ্র ! তুমি তবু দিগন্তের নির্নিমেষ নীলে
কি অমোঘ জেগে আছো সমস্ত শূন্যতা জয়ী স্বরাট একাকী।

(১৯৬০-৬১ সালের পত্রিকা হইতে গৃহীত)

একটি সুদূর ইচ্ছে

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র

একটি সুদূর ইচ্ছে
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যালোকের বিজন অবসরে,
কখনও বা ঘুমের মধ্যে, কখনও বা চেতন চোখের 'পরে
মাঝে মাঝেই মধুর হানা দিচ্ছে।
মাঝে মাঝেই শুনছি যেন মৃদু হাতের রিনিঝিনি :
শিশিরপথে বনফুলের উতল কলোচ্ছ্বাস
ওই ছড়িয়ে যায় যে ! ওগো চিনি চিনি
চিনি তোমায়, ওগো তোমার শিথিল কেশপাশ
মনসায়রের নীল ছুলিয়ে অন্ধকারের অবোধ ইন্দ্রজাল।

একটি সুদূর ইচ্ছে
অঝোর রঙে রাতুল চক্রবাল
রাঙিয়ে মাঝে মাঝেই মধুর দিচ্ছে হানা দিচ্ছে।
মনে পড়ছে বাংলা দেশে খড়ো ঘরের চাল
আমার মায়ের মত,
মনে পড়ছে নদীতীরের বুড়ো বটের ছায়
অচিন পাখীর দিনকাটানোর কুলভাসানোর ব্রত,
নিকিয়ে নেওয়া মাটির আঙিনায়
মনে পড়ছে মনে পড়ছে মনে
অনাগতের কল্পনাতে স্মৃতির বরণ লাগছে সঙ্গোপনে॥

একটি সুদূর ইচ্ছে
সকাল-দুপুর সন্ধ্যালোকের বিজন লগন

ভোর করে ওই মধুর হানা দিচ্ছে।
কতদিনের প্রবাসী ওই স্মরণগগন
নিজের ঘরে ফিরতে বলে, নিজের ঘরে, শুধু নিজের ঘরে ;
কখনও বা ঘুমের মধ্যে, কখনও বা চেতন চোখের 'পরে
কতকালের স্বজন বাঁশের ঝাড়
দেয় ইশারা। পিছের বাগানটার
জড়্লাছাওয়া ছবি যেন অনেক স্বজন বুনো পাখীর বাস।
কচুবনের ওধার দিয়ে পুকুর
ঝুঁকে পড়া বেনাম লতার নগ্ন দেহের মুকুর
ওই ভাসিয়ে দেয় যে! ওগো এই যে কলোচ্ছাস,—
চিনি চিনি, এ যে তোমার চোখের অতল শিখা,—
সেই আলোতেই গোপন হাতে আমায় জ্বেলে নিচ্ছে,
আমায় টেনে নিচ্ছে যে তার দিকদোলানো প্রচণ্ড উর্মিকা :
একটি সুদূর ইচ্ছে!

(১৯৫৭ সালের পত্রিকা হইতে গৃহীত)

বন্ধুর জন্মদিনে

মানস রায়চৌধুরী
প্রাক্তন ছাত্র

এইতো রয়েছি আমি, কেন মিছে করো হাহাকার ?
দুয়ারে পায়ের ছাপ, ছেঁড়া চটি ধুলোর বাহার
দেখে কি যায়না বোঝা কাছে আছি সব কিছু নিয়ে—
ভালোবাসা, অভিমান কিম্বা হাসি বাতাসে ছড়িয়ে।

মনে ভাবো কাছে নেই। আমি কিন্তু অদূরেই আছি
চোখ মেলে দেখো ঠিক দেখতে পাবে একাগ্র মৌমাছি
কী এক মধুর খোঁজে এই রৌদ্রে ঘোরেফেরে। কোনো
বাসাতেই বসে না সে। চির আশা রেখেছে এখনো।

দুঃখের তিমিরে ঢাকে সব স্বপ্ন, তবু আমি কই
কপাট পেরিয়ে দূরে গিয়েছি কি ? বাইরে অথই
আনন্দের ঢেউ ফোটে। উদাসীন আমি একবারো
সেখানে যাইনি। ভাবি এবারেই দেখা পাবো কারো।

(ঐ)

রোল নাম্বার সিক্স্

বিমল মিত্র
প্রাক্তন ছাত্র

রোল নাম্বার সিক্স্, রোল নাম্বার সিক্স্—

তখন আমাদের ব্রিটিশ হিস্ট্রি পড়াতেন অমলচন্দ্র রায়চৌধুরী। দীর্ঘদেহ সুদর্শন চেহারার মানুষ। কোনো দিকে চেয়ে দেখেন না। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ম করে ক্লাসে আসেন। অন্য ক্লাসে যা-ই হোক, এখানে গোলমাল করা চলবে না। ইতিহাস নয় তো উপন্যাস। ভারি উপাদেয় তাঁর লেক্চার। অন্য কলেজ থেকে পর্যন্ত ছাত্ররা শুনতে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। তিনি এসেই রোল কল্ করতে শুরু করেন—ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ্, সিক্স্—

ছ'নম্বরে এসেই একবার থামলেন। সামনের দিকে চেয়ে আবার ডাকলেন—রোল নাম্বার সিক্স্—

প্রথবার কে যেন বলেছিল—ইয়েস্ স্যার। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ডাকে আর সাড়া শব্দ নেই।

প্রক্সি-দাতা তখন সভয়ে আত্মগোপন করেছে।

অমলবাবু আবার একবার ডাকলেন—রোল নাম্বার সিক্স্—বিমল মিত্র?

চোখ দুটো সারা ক্লাসের চৌহদ্দি ঘুরে এল। কোথাও নেই অপরাধী।

অমলবাবু বললেন—বিমলকে একবার দেখা করতে বোলো তো আমার সঙ্গে। আমার বিশেষ দরকার আছে। ভয় নেই, বক্‌ব না তাকে।

অপরাধী এ-সবের কোনো খবরই রাখে না। কলেজের উল্টোদিকে হাজরা পার্কের একটি নির্জনতম কোণে তখন ভীমপলশ্রীর ঠুংরি চলেছে। গায়ক অনুপম ঘটক আর শ্রোতা আমি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার আর্টস-এর ছাত্র হলে কি হবে, রসের কারবারে দুজনেই আমরা তখন প্রায় মহাজন। প্রাক্‌যুদ্ধের কলকাতা শহর। রেশন, কন্ট্রোল, কিউ-এর তখন নাম-গন্ধ পর্যন্ত কেউ শোনে নি। অনুপম গানগায় আর আমি রসের যোগান দেই। অনুপম ঘটকের ভবিষ্যৎ তখন প্রায় সুনির্দিষ্ট। একদিন গানের ওস্তাদ হবে সে, এই তার অভিলাষ। আর আমি? আমার কামনা বড় গোপনীয়। কেউ জানে না। আমি নিজেও তখন মতিস্থির করতে পারছি না। জীবনের সঙ্গে শিল্পোবোধের তখনও বিরোধ-নিষ্পত্তি হয় নি পুরোপুরি। এমন সময় এই কাণ্ড।

এ আমার সাহিত্যজীবনের একেবারে আদি পর্বের কথা। দু-চারটে পদ্য-জাতীয় রচনা যে কয়েকটা কাগজে তখন না বেরিয়েছিল তা নয়। তবে যারা জানত তারা তেমন উৎসাহ দেয়নি। গুরুজন স্থানীয় লোকেরা বিশেষ কেউই জানতেন না। কেউ কেউ জানলেও বালখিল্য বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। কেবল আমার এক প্রাইভেট টিউটর, কালিপদ চক্রবর্তী মশাই—যিনি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে প্রায় প্রতিদিনই আমার অভিভাবকের কাছে নালিশ করতেন—সেই তিনিই কি জানি কেমন করে আমার একটা কবিতা হঠাৎ দেখে ফেললেন। তখন বোধ হয় ক্লাস টেনে পড়ি। কি দয়া হল তাঁর কে জানে, একখণ্ড "গীতাঞ্জলি" নগদ মূল্যে কিনে আমায় উপহার দিয়ে ফেললেন। বললেন—না, তোমার লেখছি ভাব আছে।

কিন্তু এমন উদাহরণ খুঁজলে সারা জীবনে বড়জোর একটা কি দুটো মিলবে। সৌভাগ্যক্রমে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বা মানুষের সংসারে সারাজীবন নিরুৎসাহ করবার লোকের কখনো অভাব হয় নি আমার। সেই বয়সেই নিন্দে, অবজ্ঞা আর অবহেলা পেতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে ছিলাম যে, আস্তে আস্তে নিজেকে জনতা, সভা-সমিতি, ভীড় থেকে সরিয়ে অন্তরালে বাস করার স্বভাব প্রায় মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। প্রশংসা করলে সন্দেহ হত, ভয় হত। তাই ক্লাসের ছেলেদের মুখে যখন খবরটা শুনলাম যে অমলবাবু ডেকেছেন মনে ভয়ই হল—হয়তো বকুনি খেতে হবে, শাস্তি পেতে হবে প্রক্সির ব্যবস্থা করবার জন্যে।

ঠিক করলাম, দেখা করব না। না হয় হিস্ট্রির ক্লাসে বরাবরই গর হাজির থাকব। নিন্দে, অপবাদ, অবহেলা, শাস্তির বোঝা সাধ করে আর বাড়াব না। আমার তো আর মুখ চিনে তিনি বসে নেই। ক্লাসে হাজির না হলেই হল।

এরই দু চার দিন পরের কথা। পুরোনো আশুতোষ কলেজের সামনে তখন বেশ খানিকটা জায়গায় বাগান ছিল। সেই বাগানের পাশে কলেজে যাওয়ার রাস্তার উপর সেদিন দু-তিন জন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি। ক্লাস তখনো বসেনি আর কি।

হঠাৎ কানে এল—বিমল আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে একবার দেখা কোরো তো।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি অমলবাবু। নিঃশব্দে পাশ দিয়ে যেতে যেতে কথাগুলি বললেন। সর্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। এত দিন পরেও এখনো মনে রেখেছেন নাকি! চিনতেই বা পারলেন কি করে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেছন পেছন গেলাম। তিনি সোজা রাস্তা দিয়ে ততক্ষণে লাইব্রেরীতে গিয়ে বসেছেন। আমি অপরাধীর মত দাঁড়ালাম সামনে গিয়ে। বললাম—আমায় ডেকেছিলেন স্যার আপনি?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, "ভারতবর্ষে" তুমি একটা গল্প লিখেছ ?

"ভারতবর্ষ"! লিখেছি আর কোথায়, পাঠিয়েছি বটে! কিন্তু সে তো কারো জানবার কথা নয়। যদি কেউ জেনে থাকে তো জেনেছে একমাত্র পোষ্টাপিসের পিওন। আর সে তো এখনো ছাপাই হয় নি। হবে কি না তাই বা কি করে জানব!

সবিনয়ে বললাম—একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম ওখানে।

অমলবাবু বললেন—সেটা ছাপা হবে। এ মাসেই বেরোবে।

এসেছিলাম শাস্তির আশঙ্কা করে, কিন্তু এ যে নাকের বদলে নরুন; তবু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না। জিজ্ঞেস করতে পারলাম না অমলবাবু "ভারতবর্ষ" পত্রিকার কে! সম্পাদক তো জলধর সেন। অমলবাবু তো সাহিত্যিকও নন যে খবর জানতে পারবেন। ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না।

অমলবাবু আবার বললেন—কাগজ বেরলে তুমি সম্পাদকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো।

টাকা! শুধু সোনা নয়, আবার সোহাগা! রাজকন্যাই নয়, অর্ধেক রাজত্বও!

বললে—হ্যাঁ, প্রথম লেখার জন্যে ওঁরা টাকা দেন না বটে, তবু তুমি পাবে। কিন্তু—

বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তার পর বললেন—কিন্তু, তুমি ও-রকম অশ্লীল লিখতে গেলে কেন? লেখাটা আমি পড়েছি, তুমি লিখতে পারবে একদিন, কিন্তু তুমি তো এখনো দেখতে শেখনি—বস্তুকেই দেখেছ কেবল, বাস্তবকে তো দেখনি; শুধু factই দেখেছ, truth তো দেখনি—ও দুটোতে যে অনেক তফাৎ। —কিছু মনে কোরো না, তুমি আমার ছাত্র বলেই তোমাকে বলছি—

আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলেন—পৃথিবীটা তো ধুলো মাটি রক্ত মাংস ক্ষুধা দিয়ে তৈরী, কিন্তু এ পৃথিবীতে যা-কিছু দেখি সবটাই কি পার্থিব? ভুলে যেয়ো না, শিল্পীর কারবার পৃথিবীকে নিয়ে নয়, পার্থিবকে নিয়ে। পৃথিবীর সঙ্গে পশুর যোগ শুধু খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধ নিয়ে কিন্তু মানুষের সঙ্গে তা নয়। মানুষ যেমন পৃথিবীর কাছ থেকে নানা ভাবে নেয়, তেমনি পৃথিবীকে নানাভাবে মানুষের যে দিতেও হয়। দিতে হয় মানুষের সৌন্দর্যবোধ, কল্যাণকামনা, শিল্পসৃষ্টি। ··· নইলে শুধু খাওয়া-পরার সম্বন্ধটুকু নিয়ে থাকলে মানুষ হিসেবে তো পঙ্গু হয়ে যাবে একেবারে—সত্যিকারের মানুষ আর হতে পারবে না।

এমনি অনেক কথা বলে গেলেন তিনি। কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না।

আসবার সময় বললেন—এত কথা বললাম বলে কিছু মনে কোর না। তুমি আমার ছাত্র বলেই

বললাম। অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজকেও আমি এমনি কথাই বলেছি। তারপর আমায় বললেন—আচ্ছা, এখন যাও।

ফিরে এলাম। কিন্তু মনে আছে, তার পর দিন সাতেক যেন একেবারে মগ্নচৈতন্য হয়ে রইলাম। যতদুর মনে পড়ে এ বোধ হয় ১৩৪০ সালের কথা। ভারতবর্ষের সে গল্পটাও আমার আজ হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে বলে অবশ্য আমার কোন দুঃখও নেই। অনেক কিছুই তো হারিয়েছি। অত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আশুতোষ কলেজে আর কেই বা তখন ছিল। আমি অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবহেলিত একজন ছাত্র। আমি অনেকবার ভেবেছি আমার ওপর এ-স্নেহ তাঁর কেন হয়েছিল? গেজেটে আমার পাশ করার খবর পেয়ে অযাচিত অভিনন্দন-পত্র পাঠিয়েছিলেন। হয়তো আমার ওপর অনেকখানি আশা করেছিলেন তিনি। তাঁর আশা আমি পূর্ণ করতে পারিনি জানি। একদিন তিনি দেখে গেছেন আমি লেখাই ছেড়ে দিয়েছি, আমাকে পাঠক-সম্পাদক সবাই ভুলে গেছে। তাঁর জীবদ্দশায় আমি "রোল নাম্বার সিক্স" হয়েই ছিলাম কেবল। সে-কাহিনী আমি আমার "কন্যাপক্ষ"তে লিখেছি।

তারপর কবে আশুতোষ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, পোস্ট্‌ গ্রাজুয়েট পেরিয়ে এসে একদিন হঠাৎ শুনলাম, তিনি আর নেই। শুনে স্বার্থপরের মত নিজের অভাবটাই বড় করে বাজল। আজ মনে হয়, সমস্ত লোকালোকের ঊর্দ্ধে যেখানে তিনি থাকুন—তাঁর প্রসন্ন-দৃষ্টি যেন আজও আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আমি তাঁর অন্যতম নগণ্য ছাত্র—তাঁর রোল নাম্বার সিক্স। তাঁর অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজের মত আমি হইনি, হতে পারিনি, কিম্বা হয়তো হতে চাইনি! কিন্তু তা বলে তাঁর আশা কি সত্যিই বিফল হয়েছে?

আজ তিনি জীবিত নেই। থাকলে এই প্রশ্নটাই করতাম।

(১৩৬২ সালের পত্রিকা থেকে গৃহীত)

নতুন মানুষ তোমরা কারা?
তোমরা এলে ছন্নছাড়া।
পাথর পাতা সড়ক ধ'রে
যেন এলে গোলাপ ভোরে
রক্তপথের সঙ্গী হবার দাও ইশারা—

দীনেশ দাশ

আলোকের এই ঝর্ণা ধারায়

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

আমাদের পাড়ার ছেলেরা এবার সরস্বতী পূজোর সময়, কি করে বা কি কৌশলে জানি না, হঠাৎ অনেক টাকা চাঁদা তুলে ফেলল। চাঁদার পরিমাণ শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কারণ ঠিক চৌমাথার মোড়ের উপরেই আমার বাড়ী আর বাড়ীর ঠিক সামনেই প্রায় মুখোমুখি বললেই চলে,—ছোট্ট একটা রেলিংঘেরা পার্কে পূজোর প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছিল। এতগুলি কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে ছেলেরা যে মাইকের গান চালিয়ে কি প্রলয় কাণ্ড বাধাবে তাই অনুমান করেই আমার এই আতঙ্ক। শুধু পূজোর দিনটিই নয়, আজকাল আবার প্রতিমা নিরঞ্জন উৎসবটিকে দু'দিন তিনদিন এমন কি এক সপ্তাহ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া চলে এবং হামেশাই তা করা হয়। সুতরাং আতঙ্কটা অস্বাভাবিক নয়।

আমার সেই আতঙ্কের কথা হয় তো একটু প্রকাশই করে ফেলেছিলাম, একটি মাতব্বর গোছের ছেলে অভয় দিয়ে বলল "না স্যার, আমরাও ঠিক করেছি এবার আর মাইকের মধ্যে যাব না, তার বদলে প্যাণ্ডেল আর সামনের এই রাস্তা আলো দিয়ে ভাসিয়ে দেব। অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে—তিন হাত পর পরই একটা করে নিওন লাইট বসবে। হাজার হাজার নিওন লাইটের ঝাড়। দেখবেন স্যার দিন না রাত টেরই পাবেন না তখন।"

ছেলেটির চোখে-মুখে যে আত্মতৃপ্তির ভাব দেখলাম তাতে তাকে দমিয়ে দিতে কেমন মায়া হল। অথচ ভিতরে ভিতরে মাস্টারোচিত কর্তব্যের একটা দংশনও অনুভব করছিলাম। শেষ পর্যন্ত শেষেরটাই জয় হল, ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললাম, "কিসের আলো বললে?"

ছেলেটি আগের মত সগর্বে বলল "নিওন লাইট স্যার। যা জিনিস বসাব দেখলে জীবনে ভুলতে পারবেন না।"

কী রং এর আলো?

"কি রং এর আবার! সাদা চোখে জুড়ানো আলো! গাছের গায়ে লাল নীল সবুজ বালব লাগিয়ে সস্তা চটকদার আলো দিয়ে চোখ ভোলানো নয়, দস্তুর মত—"কথা শেষ না করে ছেলেটি আমার ঘরের দেওয়ালে আঁটা ফ্লুওরেসেন্ট আলোর টিউবটার দিকে তাকিয়ে বলল "ঐ তো আপনার ঘরেও তো রয়েছে স্যার! তবে এখানে মাত্র একটা, আমরা বসাব হাজার হাজার।"

"কিন্তু ওটা তো তোমার ঠিক নিওন লাইট নয়।"

"নয়? সে কি বলছেন স্যার।"

"ঠিক বলছি। ওর নাম ফ্লুওরেসেন্ট লাইট। দু'টোর মধ্যে খানিকটা তফাৎ আছে যে, নিওন লাইট দেখবে? এদিকে এস।"—বলে অনতিদূরের একটা দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সাধারণ সাইনবোর্ড নয়, আলো দিয়ে লেখা একটা সাইনবোর্ড। আবার সে আলোও সাধারণ আলো নয়,—স্নিগ্ধ অথচ একটা বেশ টকটকে লাল রংয়ের আলো। অন্ধকার রাত্রে খোলা আকাশের তলে জ্বল জ্বল করছিল সেই রঙ্গিন আলো দিয়ে লেখা সাইনবোর্ডটা। বললাম, ঐ হচ্ছে আসল নিওন লাইট। ফ্লুওরেসেন্ট আলোকে নিওন লাইট বলা উচিত নয়—যদিও শতকরা নব্বই জন লোক বোধ হয় তাই বলে।" তারপর অল্প কথায় দু'টোর তফাৎও বুঝিয়ে দেওয়া গেল তাকে।

ছেলেটির মুখে প্রথমে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপর তা রূপান্তরিত হ'ল খুশীতে। সেই অবাক খুশী মুখেই সে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল, সম্ভবত বন্ধুদের জ্ঞানদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

সত্যি, নিওন লাইট আর ফ্লুওরেসেন্ট লাইট দু'টোই আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একটু একটু করে জড়িয়ে যাচ্ছে। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এদেশে ওদের চলন ছিল না বললেই চলে, কিন্তু মাঝের এই ক'টা বছরেই কী পরিবর্তন! আজ যদি কোন পাড়া-গাঁ থেকে সদ্য-আমদানী দেহাতি লোককে কলকাতার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তার অবস্থাটা কল্পনা করা কঠিন নয় "চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া" কথাটা বললে হয় তো কিছুই বলা হবে না, বরঞ্চ কবির ভাষায় বলা যেতে পারে লোকটিকে "আলোকের ঐ ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে" দেওয়া হচ্ছে। লাল, নীল, সবুজ, হলদে অসংখ্য রংএর অসংখ্য আলোয় চারদিক ছেয়ে আছে। শুধু আলোর রেখা নয়—রঙ্গিন আলোয় আঁকা ছবি! একবার জ্বলছে, একবার নিবছে,—অন্ধকার আকাশের গায়ে রং এর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে যেন! জ্বলজ্বলে আলো—কিন্তু তার দিকে তাকালে চোখে জ্বালা করে না, মনে হয় সে আলোর মধ্যেও কেমন একটা স্নিগ্ধতা মাখানো রয়েছে। বিজ্ঞাপনের যুগ এটা। সে বিজ্ঞাপন যত চটকদার হবে ততই তা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর এই আলো বিজ্ঞাপনের মতো চটকদার আর কি হতে পারে? আলো দিয়ে তৈরী নকল বিজলী-পাখা আকাশের গায়ে বন বন করে ঘুরছে, আলো দিয়ে গড়া টি-পট্ থেকে চায়ের মত তরল আলো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে—এ রকম বিজ্ঞাপন তো চোখের সামনেই দেখছি। রাস্তা-ঘাটেও এখন সাধারণ বিজলী বাতির (গ্যাস লাইটের যুগ তো শেষ হয়ে গেছে বলা চলে) বদলে ফ্লুওরেসেন্ট আলো ক্রমেই জায়গা দখল করছে। তেমন করে বসাতে পারলে দিন কি রাত বোঝাই মুশকিল।

অথচ সত্যি কথা বলতে কি, ক'জন লোক এই আলোর ভিতরকার রহস্য ঠিকমত জানে?

প্রথমে নিওন লাইট দিয়েই সুরু করা যাক্। নিওন লাইটে লেখা কোন বিজ্ঞাপন বা সাইন-

বোর্ড যদি দিনের আলোয় ভাল করে খুঁটিয়ে দেখা যায় তবে দেখা যাবে আসলে ওগুলো ফাঁপা কাঁচের নল দিয়ে তৈরী আকাবাঁকা অক্ষর ছাড়া আর কিছুই না। তা হলে? ফাঁপা নলের ভিতর থেকে রাত্রে অমন স্নিগ্ধ আলো বেরোয় কি করে?

আসলে ঐ নলগুলো ফাঁপা হলেও ফাঁকা নয়। ওর ভিতরকার বাতাস বার করে নিয়ে ওখানে খুব মৃদু চাপে ভরে দেওয়া হয় এক রকম গ্যাস তার নাম নিওন গ্যাস। তবে সব সময় যে নিওন গ্যাসই থাকে তা নয়. নিওনের মত আর কয়েকটা গ্যাস আছে, যাদের বলা যায় নিওনের জ্ঞাতভাই, যেমন আর্গন, হিলিয়াম, ক্রিপ্‌টন বা জেনন্ প্রভৃতি গ্যাস, তাও অনেক সময় ভরে দেওয়া হয়। সময় বিশেষে একাধিক গ্যাস মিশিয়েও ভরে দেওয়া যেতে পারে। তারপর অন্ধকার রাত্রে ঐ গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিলেই সে গ্যাস বিচিত্র আলোকচ্ছটা বার করতে থাকে। এক এক রকম গ্যাসে এক এক রকম রং এর আলো বেরোয়। নিওন গ্যাসে বেরোয় ঈষৎ হলদে, লাল আলো, আর্গনে হাল্কা নীল, ক্রিপ্‌টনে গাঢ় নীল, জেননে নীলাভ সবুজ ইত্যাদি। নিওনের সাথে আর্গণ মিশিয়ে দিলেও হাল্কা বেগুনী থেকে নীলাভ এক রকম আলো পাওয়া যেতে পারে। সময় সময় রঙ্গিন কাঁচের নল ব্যবহার করে আরো নতুন নতুন রং পাওয়া যায়। যেমন, কাঁচের নল যদি হাল্কা লাল করে নেওয়া যায় তাহলে তার ভিতর নিওন গ্যাস ভরলে টকটকে লাল আলো পাওয়া যাবে। আবার গ্যাসের চাপ ইচ্ছেমত কম-বেশী নিয়ন্ত্রিত করেও একই গ্যাস থেকে বিভিন্ন রং এর আলো পাওয়া যেতে পারে। নিওন গ্যাস দিয়েই প্রথম শুরু হয়েছিল বলে এই আলোকে বলা হয় নিওন লাইট। এখনও অন্যান্য গ্যাসের চেয়ে নিওন গ্যাসই বেশী ব্যবহার করা হয়।

এই নিওন গ্যাস জিনিষটা কি? এটা কিন্তু বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরীতে তৈরী করা কোন গ্যাস নয়, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের মতই একটি মৌলিক পদার্থ যাকে ইংরাজীতে বলা হয় এলিমেন্ট। কিন্তু মৌলিক পদার্থ হলে কি হবে, সাধারণ মৌলিক পদার্থের তুলনায় এর চালচলন একেবারে আলাদা। অন্যান্য প্রায় সব মৌলিক পদার্থ ই, সুযোগ পেলেই, পছন্দ মত অপর মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিশে এক একটা যৌগিক পদার্থ যাকে ইংরাজীতে বলে কম্পাউণ্ড—তৈরী করতে পারে এবং করেও। নিওন কিন্তু ভীষণ একাচোরা। নিজের ব্যক্তিত্ব (?) সম্বন্ধেও হয়তো ভারী সজাগ। তাই সে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে কক্ষনো অপরের সঙ্গে মেলা এর কোষ্ঠীতে লেখেনি। এর জন্যই রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন নিষ্ক্রিয় বা "ইনঅ্যাকটিভ" গ্যাস। নিওন, আগেই বলেছি, একটা এলিমেন্ট বা মৌলিক পদার্থ তাই ওকে "ইনঅ্যাকটিভ এলিমেন্ট" ও বলা চলে। নিওনের যে চারটি জ্ঞাতভাইদের কথা আগে বলেছি—আর্গন, হিলিয়ম্, ক্রিপটন, জেনন্—তারাও ঠিক এই রকম নিষ্ক্রিয় গ্যাস। সমস্ত রসায়ন জগতে এদের জুড়ি নেই। সম্প্রতি রেডন্ নামে আর একটি নব আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থ এদের দলে যোগ দিয়েছে—এটি আবার রেডিয়াম-ইউরেনিয়ামের মত তেজস্ক্রিয়ও।

এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির আবিষ্কারের গল্পও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কারন রেডন্ ছাড়া সবগুলিই আমাদের আশেপাশে বাতাসের মধ্যেই ছড়িয়েছিল— কেউ তা টের পায় নি।

আমাদের চারদিকে যে বাতাস সর্বদা আমাদের ঘিরে রেখেছে, যাকে আমরা ভাল কথায় বায়ুমণ্ডল বলি তা মোটামুটি চারভাগ নাইট্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে তৈরী। অবশ্য ছাড়া আরও ২।৪টে জিনিষ অতি সামান্য পরিমাণে তার সঙ্গে মিশে থাকে। যেমন জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শ বছর আগে ক্যাভেণ্ডিশ্ নামে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী (যিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে জল মৌলিক পদার্থ নয়—অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলিয়ে তৈরী) একবার বাতাসের নাইট্রোজেন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে তার মনে হ'ল যে, যে অংশটার সবটাই নাইট্রোজেন বলে তার ধারণা ছিল তার সবটাই যেন নাইট্রোজেন নয়. আর কিছু দিয়ে ঐ নাইট্রোজেনটুকু টেনে নিলেও যেন খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস থেকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য এটুকু লক্ষ্য করা ছাড়া তিনি আর তখন কিছু বলতে পারেন নি। আর প্রায় একশ' বছর পরে লর্ড র‍্যালে নামে আর একজন বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী আবার বাতাস নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। বাতাসে যে গ্যাস যতটা পরিমাণ আছে বলে জানা ছিল র‍্যালে সেই সব গ্যাস ঠিক ঠিক সেই সেই পরিমানে মিশিয়ে একটা কাচের নলে ভরে নকল উপায়ে বাতাস তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই নকল বাতাসের বিভিন্ন গুণ পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে আসল বাতাস আর তাঁর তৈরী নকল বাতাসের ঘনত্ব অর্থাৎ 'ডেনসিটি' ঠিক এক রকম নয়—সামান্য একটু তফাৎ দাঁড়াচ্ছে। তিনি তখন বাতাস থেকে নাইট্রোজেন বার করে নিয়ে সেই নাইট্রোজেনের ঘনত্ব বার করলেন, আর সেই সঙ্গে পরীক্ষাগারে রাসায়নিক উপায়ে তৈরী করা নাইট্রোজেনের ঘনত্বও মাপলেন। দেখা গেল এক্ষেত্রেও দু'টোর মধ্যে ঐ রকম তফাৎ দেখা যাচ্ছে। র‍্যালের তখন মনে পড়ল ক্যাভেণ্ডিশের সেই পরীক্ষার কথা। তিনি বার বার পরীক্ষা করে তাঁর পরীক্ষার ফল যাচাই করে দেখলেন। অবশেষে তাঁর ধারণা হ'ল নিশ্চয়ই তাহলে বাতাসে শুধু নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন নেই, যেমন আছে কার্বনডাইঅক্সাইড জলীয় বাষ্প ইত্যাদি তেমনি হয়তো আরও কোন নতুন ধরণের অজানা গ্যাস মিশে আছে অতি সামান্য পরিমাণে। কি হতে পারে সেটা?

তখন লর্ড র‍্যালের সঙ্গে কাজে নামলেন স্যার উইলিয়াম্ র‍্যামজে। দুই বিজ্ঞানী মিলে দিবারাত্র কাজ করে যেতে লাগলেন পরীক্ষাগারে। পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল না। একদিন ধরা পড়ল—সত্যি সত্যি বাতাসের মধ্যে আরও এক রকম অজানা গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে মিশে আছে, আর এই গ্যাসটি এমনি অদ্ভুত যে অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গেই মিলে মিশে একত্র হয়ে কোন যৌগিক পদার্থ গড়ে তুলবার ক্ষমতা এর আদপেই নেই। অর্থাৎ একেবারে যাকে বলে নিষ্ক্রিয়। এ ধরণের কোন নিষ্ক্রিয় পদার্থের কথা এর আগে কোন বিজ্ঞানীর জানা ছিল না। তাই আবিষ্কারটা খুবই বড়দরের হ'ল

বলতে হবে। কি নাম দেওয়া যায় গ্যাসটার? র‍্যামজে অনেক খুঁজে পেতে শেষে গ্রীক্ ভাষা থেকে একটা লাগসই নাম বার করলেন—'আর্গন', মানে 'অলস'।

কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। বাতাসকে যেমন তেমন ভাবে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে আর ঠাণ্ডা করে জলের মত তরল করা যায় এ তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর র‍্যামজে তরল বাতাস নিয়েও পরীক্ষা করছিলেন। এখন যে সব উপাদান দিয়ে বাতাস তৈরী তার সবগুলি একই উত্তাপে তরল থেকে বাষ্প হয় না। কোনটা খুব কম তবেই বাষ্পাকারে উড়ে যায়, কোনটার বাষ্প হতে তার তুলনায় আর একটু বেশী তাপ লাগে। নাইট্রোজেন শূন্য ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড থেকে ১৯৫ ডিগ্রী নীচে এলেই তরল থেকে বাষ্প হয়ে যায়। কিন্তু অক্সিজেন শূন্য থেকে ১৮২ ডিগ্রী নীচেও তরল থাকতে পারে। র‍্যামজে দেখলেন, তরল আর্গনও শূন্য থেকে ১৮৫.৮৫ ডিগ্রী নীচে এলে তবেই বাষ্পাকারে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং যদি এই তাপ নিয়ন্ত্রণ করে করে তরল বাতাসকে ফুটতে দেওয়া যায় তাহলে ওর ভিতরকার পৃথক পৃথক উপাদানকে হয়তো সহজেই আলাদা করে ফেলা যেতে পারে। সত্যিই তাই সম্ভব হ'ল। র‍্যামজে এই প্রতিক্রিয়ায় তরল বাতাস থেকে আর্গন সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে তরল বাতাস থেকে আর্গন বার করবার সময় আরও কয়েকটা চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেল। দেখা গেল এত দিন যেটাকে আর্গন বলে মনে করা হ'ত সেটা কিন্তু খাটি আর্গন নয়। আর্গনের সঙ্গে সেখানে জড়িয়ে আছে তার আরও চারটি জাতভাই তারই মত নিষ্ক্রিয় চারটি গ্যাস। এই গ্যাসগুলোরও তখন নতুন নতুন নাম দেওয়া হ'ল। একটার নাম দেওয়া হ'ল 'নিওন' অর্থাৎ 'নতুন', একটার নাম 'ক্রিপ্‌টন' অর্থাৎ 'লুকানো', একটার 'জেনন' অর্থাৎ 'অপরিচিত'। বাকি গ্যাসটার নাম দেওয়া হল 'হিলিয়াম' সূর্যকে বলা হয় 'হিলিওস্'। ঐ গ্যাসটা সূর্যের মধ্যে আছে বলে আগে থেকেই সন্দেহ করা হয়েছিল সূর্যের আলো পরীক্ষা করে, তাই এই নাম।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জড়াজড়ি করে থাকে, তাই এদের একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করা সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানী সে উপাও বার করলেন। নারকেলের মালা পুড়িয়ে যে কাঠকয়লা পাওয়া যায় তার কতকগুলির গুনের কথা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। সে গুণটা আর কিছু নয়—বিশেষ অবস্থায় তার গ্যাস পছন্দ-অপছন্দ করার বা আরো ভাল করে বললে, গ্যাস বাছাই করার গুণ। ঐ কাঠ কয়লাকে যদি শূন্য ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের চেয়েও একশ ডিগ্রী নীচেকার উত্তাপে রেখে তার ওপর ঐ নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই কাঠ কয়লা শুধু আর্গন, ক্রিপ্‌টন, আর জেননকে শুষে নেয়, হিলিয়াম আর নিওন পড়ে থাকে। এরপর যদি আবার ঐ রকম কোন কয়লাকে আরও ঠাণ্ডা করে শূন্য ডিগ্রী থেকে ১৮৫ ডিগ্রী নীচেকার উত্তাপে নামিয়ে আনা যায় তা হলে এবারে সে কয়লা কেবলমাত্র নিওন গ্যাসটুকু শুষে নেবে, হিলিয়ামকে শুষবে না। সুতরাং ঐ কাঠকয়লাকে একটু গরম করলেই তার ভিতরকার সবটুকু নিওন বেরিয়ে আসবে এইভাবেই বিজ্ঞানীরা নিওন গ্যাস সংগ্রহ করছেন।

নিওন লাইটের মত ফ্লুওরেসেন্ট লাইটেরও চাহিদা আজকাল ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কাজেই এ সম্বন্ধেও ২/৪ কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। নিওন লাইটের যেমন ফাঁপা নলের মধ্যে থাকে নিওন গ্যাস, ফ্লুওরেসেন্ট লাইটে তেমনি থাকে পারার বাষ্প বা মার্কারী ভেপার। নিওন গ্যাস যেমন বিদ্যুৎ চালালে লাল আলো বার করতে পারে তেমনি এই পারার বাষ্প বা মার্কারী ভেপার বার করতে পারে ঈষৎ নীলচে আলো। তাছাড়া পারার বাষ্প থেকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মিও বেরুতে থাকে। কিন্তু ফ্লুওরেসেন্ট টিউবে শুধু ঐ পারার বাষ্পই থাকে না—ঐ টিউবের গায়ে মাখান থাকে কোন একটা ফ্লুওরেসেন্ট পদার্থ। ফ্লুওরেসেন্ট পদার্থ বলা হয় সেই সব জিনিষকে যেগুলি অন্য আলোকরশ্মি থেকে আলো শুষে নিয়ে খানিক পরে নিজেরাই দীপ্তি ছড়াতে পারে। ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড এই রকম একটি জিনিষ। এ ছাড়া আরও আছে। ফ্লুওরেসেন্ট টিউব জ্বালালে অর্থাৎ তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে তার ভিতরকার পারার বাষ্প আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ছড়াতে থাকে, আর টিউবের গায়ে মাখানো ফ্লুওরেসেন্টের প্রলেপ সেই রশ্মি শুষে নিয়ে নিজেরাই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে; ফলে আমরা ঐ স্নিগ্ধ প্রায় দিনের আলোর মতই সাদা আলো দেখতে পাই। মোটামুটি ব্যাপারটা এই, তবে এই আলো জ্বালানোর প্রক্রিয়ায় আরও কিছু খুটিনাটি ব্যাপার আছে যার বিশদ আলোচনা এখানে অল্প কথায় করা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে সাধারণ বিজলী বাতির আলো আর ফ্লুওরেসেন্টের আলোর পার্থক্য। সাধারণ বিজলী বাতির মধ্যে খানিকটা সূক্ষ্ম বাঁকানো তার থাকে তাকে বলা হয় ফিলামেন্ট। তা ছাড়া ঐ বাতির মধ্যে কোনও বাতাস থাকে না। যখন ঐ বাতির মধ্যে বিদ্যুৎ চালানো হয় তখন ঐ ফিলামেন্ট এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে তারই থেকে আলো বেরোতে থাকে। ফলে এ আলোটা হয় ঈষৎ লালচে আর আলো দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তাপও তৈরী হতে থাকে। তার মানে এখানে যে বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হয় তার সবটা আমরা আলো হিসাবে পাই না—পাই মাত্র শতকরা ২০ ভাগ, বাকিটার মধ্যে শতকরা ২৬।২৭ ভাগ তৈরী করে অদৃশ্য আলো (যেমন ইনফ্রারেড রশ্মি) যা আমাদের আলো হিসাবে কোন কাজে লাগে না। এছাড়া প্রচুর শক্তি চলে যায় ফিলামেন্টকে গরম করতে তাপ হিসাবে। ফ্লুওরেসেন্টের আলোয় কিন্তু তা হয় না। সেখানে বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ খরচ হয় আলট্রাভায়োলেট রশ্মি তৈরী করতে কিন্তু এ রশ্মির প্রায় সবটাই টিউবের প্রলেপ শুষে নিয়ে দীপ্ত হয়ে ওঠে আর আলো ছড়াতে থাকে। তা ছাড়া ঐ যে নীলচে আলোর কথা বলেছিলাম তাতেও প্রায় শতকরা ২ ভাগ আলো বেড়ে যায়। বাকি সামান্য শক্তি খরচ হয় তাপ তৈরীর কাজে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোড়াতে টিউবের দাম হিসেবে কিছু বেশী খরচ পড়লেও শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি খরচে ওতে লাভ হয় প্রায় তিন গুণ। অর্থাৎ অনেক কম 'ওয়াট' খরচ করে আমরা অনেক বেশী আলো পাই। আর যেহেতু ওয়াট কম খরচ হবার মানেই কম তাপ সৃষ্টি, তাই ফ্লুওরেসেন্ট বাতি বিজলী বাতির মত অত গরমও হয় না।

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

LIST OF PREVIOUS EDITORS—1924-1989

Prof. Mohini Mohan Mukherjee (1924), Basudev Banerjee (1925), Bibhas Roy Choudhury and S Raghavachari (1926), Subodh Biswas, Dhiren Lahiri and Satiranjan Banerjee (1927), Sasi Bhusan Barik, and Kalyan Kumar Sen Gupta (1928), Asoke Kumar Banerjee and Shyamapada Muherjee (1929), Probhat Kumar Bose and Kausik Kumar Mitra (1930), Shyamapada Mukherjee and Prafulla Kumar Sarkar (1931), Amiya Ratan Mukherjee, Bireswar Chatterjee and Batto Krishto Banerjee (1932), Hari Prasanna Chakravarty and Prabhat Sen (1933), Govinda Roy and Anil Kumar Chakraborty (1934), Binoy Ghosh and Basanta Ghosal (1935), Devaprasad Bhattacharya, Santosh Mitra and Miss Bani Roy (1936), Devaprasad Chatterjee, Narahari Kaviraj and Miss Bani Roy (1937), Santosh Bose and Miss Pratima Banerjee (1938), Subrata Sarkar and Miss Nirupama Banerjee (1939), Ramkrishna Maitra and Miss Alaka Guha (1940), Sanat Ghosal and Miss Lila Maitra (1941), Subhendu Banerjee and Miss Kshama Banerjee (1942), Samir Basu and Miss Purabi Banerjee (1943), No publication owing to 'Paper Economy' (1944), Asim Bhattacharya, Amiya Mukherjee, Jibendra Sinha Roy, Ramendranath Bose, Miss Kamala Dutt and Miss Indira Bose (1945), Editor-in-chief : Arun Kumar Dasgupta, Naresh Chandra Ghosh, Suhas Kumar Roy, Ramaprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjuka Kar and Miss Srimanti Chakravarty (1946), Editor-in-chief : Sobhanlal Mukherjee, Arun Mukherjee, Asoke Sen Gupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Miss Pushpanjali Sen (1947), Editor-in chief : Tejen Guha Roy, Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Dasgupta, Pratul Bardhan

Roy, Prithwish Roy Chowdhury, Pranakrishna Bhattacharya and Bireshwar Banerjee (1948), Satyen Mukherjee and Miss Jayasree Choudhury (1949), Madhusudan Ghosh (1950), Arunkumar Roy (1951), Smritibikash Ghosh (1952), Dulal Das (1953), Gopal Chandra Banerjee (1954), Samarendra Sen Gupta (1955), Asim Sengupta (1956), Malaya Sankar Das Gupta (1957), Ajoy Gupta (1958), Tripty Kumar Chatterjee (1959), Gopal Bandyopadhyay (1960), Sukanta Kumar Roy (1961), Barun Kumar Banerjee (1962), Jayanta Kumar Roy, Amit Kumar Ganguly (1963), Ashim Thakur, Suprakash Saha (1964), Satyabrata Sanyal, Bhabesh Ch Basu (1965) Bhagirath Misra, Hiraksubhra Pandey (1966), Ajit Kumar Mukhopadhyaya, Ranadev Sarkar (1967), Biswarup Roy Choudhury, Bhabani Prasad Dey (1968), Jiten Bhowmik, Chandra Sekhar Chokraborty (1969-70), Ganadev Chakraborty (1982-1983), Indranil Chakraborty (1983-1984), Bhaskar Rakshit (1984-1985), Sarbajit Ghatak (1985-1986), Sarbajit Ghatak (1986-1987) Biswarup Dhar Chowdhury, (1987-1988), Susan Roy (1988-1989).

★ আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ—১৯৮৯-৯০

সভাপতি
অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী

সহঃ সভাপতি
অনির্বাণ গাঙ্গুলী

সাধারণ সম্পাদক
অর্জুন রায়

যুগ্ম সহঃ সম্পাদক
রাত্রি মুখার্জী
অভিজিৎ রায়

ক্রীড়া সম্পাদক
সুধীর মেনন

যুগ্ম সহঃ সম্পাদক
তমাল দে সরকার
শৈবাল দে
মনোজ দত্ত

সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সুদীপ্ত চক্রবর্তী

যুগ্ম সহঃ সম্পাদক
কাঞ্চন চক্রবর্তী
অনির্বাণ রায় চৌধুরী
আশিষ ভট্টাচার্য

কমনরুম সম্পাদক
প্রত্যুষ ভৌমিক

যুগ্ম সহঃ সম্পাদক
বিক্রান্ত সেন চৌধুরী
সন্দীপ বোস
চিরঞ্জীব দে

পত্রিকা সম্পাদক
সন্দীপ বসু

যুগ্ম সহঃ সম্পাদক
বীমান দাশগুপ্ত
অনির্বান ঘোষ
অনুপম ঘোষ

গ্রন্থাগার সম্পাদক
সুব্রত বারিক

যুগ্ম সহঃ সম্পাদক
অঞ্জন মজুমদার
পার্থপ্রতিম দাস
নরেশ চ্যাটার্জী

ছাত্রাবাস সম্পাদকদ্বয়
সৌমেন সাহা
রাজু চ্যাটার্জী

ক্যান্টিন সম্পাদক
দীপ্তেন্দু ভট্টাচার্য

যুগ্ম সহঃ সম্পাদক
সুরজিত রায়
সুদীপ্ত দত্ত

ষ্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার সম্পাদক
শুভ্রাংশু সুর রায়

মহিলা কমনরুম সম্পাদিকা
কাকলী চ্যাটার্জী

সহঃ সম্পাদক
ইন্দ্রনীল বিশ্বাস

সংসদ বার্তা

সভাপতি

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী

১৯৯০ সনে আশুতোষ কলেজের পত্রিকা বর্তমান ছাত্রসংসদ ও পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর সুসংগঠিত পরিকল্পনা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে প্রকাশিত হল।

আশুতোষ কলেজ এ-বছর ৭৫ বছরে পদার্পণ করলো। গত ১৭—১৮ জুলাই সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব শুরু হয়েছে। এবছরের পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হলো, বিগত কয়েক দশকের আশুতোষ কলেজের পত্রিকা থেকে কিছু কিছু নির্বাচিত লেখা এ বছরের পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। আজকের নবীন প্রজন্ম এর মধ্যে দিয়ে অনুভব করতে পারবে তাদের পূর্বসূরীরা জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতেন।

আগামী দিনের পত্রিকার ঐতিহ্য, উৎকর্ষতা বিষয় বস্তুর মান অক্ষুন্ন রাখবার জন্য সকলের সহযোগিতা কাম্য। সারা বছর ধরে নবীন বরণ, বার্ষিক উৎসব, বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনায় ছাত্র সংসদ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তা প্রশংসার দাবী রাখে।

সবশেষে আশা করবো পরবর্তী ছাত্র সংসদ তাদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য বহন করবে এবং কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালাবে।

সাধারণ সম্পাদক

অর্জুন রায়

১৯৮২ সালে আশুতোষ কলেজের বুকে যে নতুন সূর্য উঠল তার রক্তিম আভা বহন করার দায়িত্ব গত একবছর আমার উপর ছিল। অর্থাৎ ছাত্র সংসদের সম্পাদকের দায়িত্ব ভার আমিই বহন করেছিলাম।

এই সময়ের পথটা শুধুই ফুলে ঢাকা ছিল না, কিছু কাঁটাও ছিল, একদিকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা ভিত্তি করে যখন দেশ ব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে আধাফ্যাসীবাদী সন্ত্রাস ত্রিপুরার বুকে নেমে এসেছে। ছাত্র সমাজ যে এর বাইরে ছিল তা নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের ছাত্র কাঠামোটাকে ভেঙ্গে নষ্ট করে দিতে চাইছে। এরই মধ্যে আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ চেষ্টা করেছে যতটা সম্ভব ছাত্রদের সঠিক পথে চালিত করার।

গত একবছরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সৃজনশীল ক্রিয়া কর্মে আমরা তার যথার্থরূপ খুঁজে পাই। লাইব্রেরীতে দুই সপ্তাহে দুটো বই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, ক্যান্টিনের খাবারের মান উন্নত করার প্রচেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অংশ গ্রহনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অবদান অস্বীকার করছি না। আমরা দুটো হষ্টেলের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এবছর দেওয়াল পত্রিকাও প্রকাশিতও হয়েছে। আমরা আমাদের চোয়াল শক্ত করে এ বছর ক্ষুদিরাম দিবস রক্ত দিয়েছি। হয়তো এসবের মধ্যেও কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বন্ধুরা, সামনের কাজআরও কঠিন, আমরা সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কলেজের সব সমস্যার সমাধান করব, আমি আশা করি, আগামী ছাত্র সংসদের মেয়াদকালেই তা সম্ভব।

ক্রীড়া সম্পাদক

সুধীর মেনন

খেলাধুলা সুস্থ সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আর এই ঐতিহ্যশালী ৭৫ বছরের পদার্পণ

কারী আশুতোষ কলেজের ক্রীড়া সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব গত একবছর আমার উপর ছিল, আমি এবং তৎসহ ছাত্র সংসদ এই বিভাগটি পরিচালনা করতে কতটা সফল তার বিশ্লেষণের ভার আমি ছাত্রছাত্রীদের উপর ছেড়ে দিলাম।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনার মাধ্যমে বার্ষিকক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের অংশ গ্রহণ স্বতস্ফূর্ত ছিল তবে তার মাত্রা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করব এই অঙ্গীকার আমরা করছি। বার্ষিক ক্রীড়ায় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। অ্যাথলেটিক্সে আমাদের দুজন ছাত্র কোলকাতার বুকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এবার আসা যাক ক্রিকেটে এবছর আমরা C-A-B পরিচালিত রাজ্য ব্যাপী আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগীতায় বিভাগীয় ফাইনাল প্রতিযোগিতা করে রানার্স হই এবং শিলিগুড়িতে প্রতি-যোগীতাটি ছিল। রোয়িংএ আমাদের কলেজের সফলতা অন্যান্য কলেজের ঈর্ষার বস্তু এছাড়া ফুটবলে আমাদের কলেজের অনেক ছাত্র ময়দানের প্রথম ডিভিশনে খেলছে। আন্তঃ ক্লাস প্রতিযোগীতা প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরবর্তীতে এই বিভাগের ফলাফল আরও উজ্বল হবে এই আশা রাখি।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

সুদীপ্ত চক্রবর্তী

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছাত্রজীবনের সঙ্গে অঙ্গাগীভাবে জড়িত, চারিদিকে যখন ছাত্রসমাজ অসুস্থ মানসিকতার শিকার হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের যুব সমাজ, ছাত্রসমাজকে বিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে, আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ সেই পথের দিশারী না হয়ে, ছাত্র সমাজকে আশার আলো দেখাচ্ছে।

গত এক বছর ধরে আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কোলকাতার বিভিন্ন কলেজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংস্কৃতিক বিভাগে পুরস্কার অর্জন করেছে। লেখাটি শেষ করার সময় খবর পেলাম সর্বশেষ প্রতিযোগীতা— ডেন্টাল কলেজ থেকে পুরস্কার নিয়ে এসেছে। ছাত্রদের সৃজনশীল ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশে এক্ষেত্রে ছাত্র সংসদের ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য। আর হৈ হৈ করে "সাংস্কৃতিক '৯০" শেষ হোলো অতীন্দ্র

মঞ্চে। তাই আগামী বছর আমি আশা করব আমার ফেলে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ উত্তরসূরী ও অধ্যাপক ছাত্রদের সহযোগীতায় আরও ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। আপাতত এখানেই শেষ ।

কমনরুম সম্পাদক

প্রত্যূষ ভৌমিক

কলেজের দোতলার করিডর দিয়ে যাওয়ার সময় একটা চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা যায়। হাঁ—আওয়াজটা কমনরুম থেকে আসে। সারাদিন ক্লাস করার ফাঁকে ছেলেরা ক্লান্তি ঘোচানোর জন্য কমনরুমকেই বেছে নেয়। ভারতবর্ষের চারদিকে যখন ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে তখন আশুতোষ কলেজএর বৈপরীত্য বহন করে—কলেজ কমনরুম এরই একটা প্রতিফলন।

আমাদের টেবিল টেনিস টিম কলকাতার অন্যতম সেরা। ক্যারাম এও গর্ব করারমতো পারফরমেন্স। আমরা এন আর এস মেডিকেল কলেজ টেবিল টেনিসএ চ্যাম্পিয়ন হই। এবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটএ ভালো পারফরমান্স দেখিয়েও জিততে পারিনি। আমাদের কলেজের ছাত্র দেবাশীষ চৌধুরী জাতীয় প্রতিযোগীতায় খুব ভালো পারফরমেন্স দেখিয়েছে।

কমনরুম চালানোর সময় অনেক ত্রুটি হয়তো দেখা দিয়েছে, তবে আমরা যতটা সম্ভব উন্নতি করার চেষ্টা করেছি, আশা করব, ছাত্রদের সহায়তায় আগামী ছাত্র সংসদ কমনরুমের আরও উন্নতি করবে।

লেডিস কমনরুম সম্পাদিকা

কাকলী চ্যাটার্জী

খেলাধূলায় যাতে ছাত্রীরাও অংশ নিতে পারে, তার জন্য আমাদের জন্য রয়েছে "লেডিজ কমনরুম" কিন্তু সকালে যোগমায়া দেবী কলেজের ইউনিয়ন রুম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সাজ-সরঞ্জামের যথেষ্ট অসুবিধে রয়েছে, ফলে একটা শূন্যতা রয়েই গিয়েছে, এর জন্য শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষ

ও ছাত্র সংসদকে দায়ী করছি না, আমারও কিছুটা দায়িত্ব থেকে যায়, তবে এবছর আমরা ছাত্রীদের জন্য কমনরুম কমপিডিশনের ব্যবস্থা করেছি এবং এটাকেই আমরা উন্নতির প্রথম সিঁড়ি হিসেবে গণ্য করব।

তাই কলেজের এই লেডিস্ কমনরুমটি আগামী দিনে একটি পূর্ণাঙ্গরূপ পাবে—এটাই আমার বিশ্বাস। সেই কারণে বর্তমানে লেডিস্ কমনরুম সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন থাকে তা হলে এখানেই কোথাও আড্ডার ফাঁকে ঐ আলোচনাটা সেরে ফেলা যাবে। কি বল ?

গ্রন্থাগার সম্পাদক

সুব্রত বারিক

পুঞ্জীভূত জ্ঞানের প্রতীক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই গ্রন্থাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানব আত্মার অমর—আলোক কালো অক্ষরের শৃংখলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে।"

অন্ধকার স্রোতের বিপরীত দিক থেকে প্রগতিশীল আন্দোলনের জোয়ার এসে আছড়ে পরে আশুতোষ কলেজের বুকে ১৯৮২ সালে। সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সাথে সাথে গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব এসে বর্তায় আমাদের ওপরে। আমাদের ন্যায্য অধিকার অর্জনের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপ রেখেছি। আমরা সফল হয়েছি ছাত্রছাত্রীদের মতামত নিয়ে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন বেশী সংখ্যক বই আনতে, দুই সপ্তাহের মেয়াদে ছাত্রছাত্রীদের হাতে দুটো করে বই দিতে, নতুন গ্রন্থাগার ভবনে একসঙ্গে অনেক জনকে বসে পড়ার সুযোগ দিতে এবং Seminar Library-কে সমৃদ্ধ করতে। ১৯৯০ সাল, আশুতোষ কলেজ বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে "পঁচাত্তর" বৎসরে পদার্পণ করল। এই গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ বছরে আমরা শপথ নেব, আগামী দিনে আমাদের কলেজের গ্রন্থাগারটিকে একটি পূর্ণাঙ্গরূপী গ্রন্থাগারে পরিণত করার।

ক্যাণ্টিন সম্পাদক

দীপ্তেন্দু ভট্টাচার্য

ক্যান্টিন! কলেজ ক্যান্টিন! আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছি যে কারণে বা অকারনে দিনের মধ্যে একটিবার অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য সেখানে না গিয়েছি। আসলে কলেজ ক্যাণ্টিনের আকর্ষণ দুপুরের ইডেন কি বিকেলের আউট্রামের থেকে কিছু কম নয়। নইলে, ক্লাসে মন বসছে না—ক্যাণ্টিন। কমনরুমে বড্ড ভীড়—ক্যাণ্টিন। লাইব্রেরী আগে ক্যাণ্টিন। কেন বলুন তো? কেন টা কেউ জানি না—শুধু জানি ভালো লাগে। ক্যাণ্টিন ভাল লাগে। ভাল লাগে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে তর্কের ঢেউ ছড়িয়ে দিতে। ভাল লাগে বন্ধুর চায়ের পেয়ালা ভাগ করে চুমুক দিতে। ভাল লাগে ক্যাণ্টিনের বিবর্ণ টেবিলে আগামী উজ্জ্বল দিনের স্বপ্নের জাল বুনতে। তবু মাঝে মাঝে মুখটা তেতো হয়ে যায় নোনতা চায়ে চুমুক দিলে বা ঘুগনীর কাঁচা ছোলা মুখে পড়লে, তবুও কলেজ ক্যান্টিন আমাদের প্রিয় আড্ডাস্থল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তবু ক্যান্টিন—সারাদিনে একবার আসতেই হবে। সুতরাং ওগুলো পরের ব্যাপার। আগামী দিনের সতীর্থদের সহযোগীতায় এ সব হয়তো কোন সমস্যাই হবে না।

ছাত্রাবাস সম্পাদক

সৌমেন সাহা ও রাজু চ্যাটার্জি

পত্রিকা সম্পাদক আমাদের বললেন যে হোষ্টেলে নিয়ে দু চার কথা লিখতে হবে। তাই হোষ্টেল সেক্রেটারী হিসেবে কলম ধরলাম। ছাত্র সংসদের কাছ থেকে যখন দায়িত্ব পেলাম তখন একধারে অনেক আশা এবং কিছুটা ভীতি নিয়েই কাজে নেমে ছিলাম। কারণ যখন বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের দরুণ কোলকাতার বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হচ্ছে তাদের হোষ্টেলগুলো বন্ধ করে দিতে, সেই সময় আশুতোষ কলেজ তার দুটো হোষ্টেল পরিচালনা করছে। ছাত্র সংসদ এই কৃতিত্বের সিংহভাগ দাবী করতে পারে।

এই বছর (১৯৮৯-৯০) ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রদের ন্যূনতম দাবী আমরা আদায় করতে পেরেছি। কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছেন দুটি হোষ্টেলের সমস্ত কিছু সারাতে। তারা জলের এবং বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত করবেন বলে সম্মত হয়েছেন। ইতিমধ্যে ১৬, বসন্ত বোস রোডস্থ হোষ্টেলে নতুন ভাবে রঙের কাজ শুরু হয়েছে এবং এই হোষ্টেলে আমরা নতুন ফোনের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আমরা দুটি হোষ্টেলেই নতুন ক্যারম বোর্ড আনতে পেরেছি। আশা করি আগামী দিনে আপনাদের আন্তরিক সাহচর্যকে পাথেয় করে আমরা আরও উন্নয়ন করতে সক্ষম হব।

ষ্টুডেন্টস ওয়েলফেয়া সম্পাদক

শুভ্রাংশু সুর রায়

আমরা অর্থাৎ আশুতোষ কলেজের ছাত্ররা অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমাদের কলেজে ষ্টুডেন্টস ওয়েল ফেয়ার বলে একটি বিভাগ আছে এবং ছাত্র সংসদ এই কৃতিত্বের অধিকারী. তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সাফল্য আমরা বিগত ৮১ সালে এক অসুস্থ-সংস্কৃতি, ছাত্র স্বার্থ বিরোধী মানসিকতাপন্ন সংসদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।

কলেজে গত ১১ই আগষ্ট শহীদ ক্ষুদিরাম দিবসে আমরা ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক সকলে হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির গড়ে তুলে ছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের হাসি মুখে রক্তদান দেখে আমি শিহরিত হয়েছিলাম, অর্থাৎ আমরা এখনো সেই রাতগুলো ভুলিনি ···।